বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা বিকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

একাদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি 1988 □ দু' টাকা

সবুজ সম্ভাবনা

সবুজ সম্ভাবনা
গ্রীনপার্টি পরিচিতি
বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ
জ্ঞান : অজ্ঞান, বিজ্ঞান
প্রসঙ্গ গণবিজ্ঞান আন্দোলন
মহিলাদের সংগ্রাম
কড়চা
জ্ঞানের গুঁতো
মৌল গবেষণা
প্রয়োজন না প্রসাধন
প্রসঙ্গ
'মাটি-খাওয়া-রোগ'
বি-ও-বি'র দশ বছর
চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য
হিরোসিমা
একটি নন-ফিকশন

বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক ত্রিমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি 1988 একাদশ বর্ষ ☐ চতুর্থ সংখ্যা

এই সংখ্যার বিষয়

1 বি-ও-বি'র কথা

2 সবুজ সম্ভাবনা
☐ সুমিত বিশ্বাস, সুজয় মুখার্জী, সুরঞ্জন কর

4 জ্ঞান : অজ্ঞান, বিজ্ঞান
☐ স্বরূপ গুপ্ত

6 গণবিজ্ঞান আন্দোলন ও মহিলাদের সংগ্রাম
☐ (মূল রচনা) পদ্মা প্রকাশ

10 জ্ঞানের গুঁতো—একটি কড়চা
☐ শিবপ্রসাদ নিয়োগী

12 মৌল গবেষণা—প্রয়োজন না প্রসাধন ?
☐ সুব্রত ভট্টাচার্য্য

14 সাবধান ! ওপরওয়ালা নজর রাখছে
☐ (সংগ্রহ) সুরশ্রী চৌধুরী

16 "মাটি খাওয়া রোগ"
☐ স্মরজিৎ জানা

17 "অখাদ্য খাওয়া রোগ"—পশুতে
☐ সুকুমার সাহা

বি-ও-বি'র দশ বছর
(ক্রোড়পত্র)

18 বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীতে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য
☐ সুদীপ্ত সরস্বতী

23 বই পরিচিতি
☐ তাপস ঘোষ

25 নিকারাগুয়ার ডায়েরী
☐ অনিল গুপ্তা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর গ্রাহকদের প্রতি

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। নিচে ঠিকানা দেওয়া হল।

বিদেশের গ্রাহক এবং প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বিদেশের গ্রাহকদের বাৎসরিক চাঁদা দশ ডলার। বাংলাদেশের গ্রাহকদের জন্য ভারতীয় টাকায় বারো টাকা। প্রাতিষ্ঠানিক চাঁদা চল্লিশ টাকা। এজেন্ট কমিশন : দশ কপির উপর পঁচিশ শতাংশ এবং একশ কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ।

যোগাযোগের ঠিকানা

ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী', c/o অভিজিৎ লাহিড়ী, EC 106, সল্ট লেক, কলকাতা-700064। সাক্ষাতে যোগাযোগ : 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-700009 (সুকিয়া স্ট্রীটে ঢুকে) সোমবার সন্ধ্যা 7-টার পর। সকলকে অনুরোধ করছি—**বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীটের ঠিকানায় চিঠি দেবেন না।**

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী যেখানে পাবেন

- ☐ বাসন্তী বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (ঘোষ কেবিনের পাশে)
- ☐ পাল বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (হরিদাস মোদকের মিষ্টির দোকানের পাশে)
- ☐ দত্ত বুক স্টল—বাগবাজার (দ্বারিক ঘোষের পাশে)
- ☐ পাতিরাম—কলেজ স্ট্রীট
- ☐ মহীন্দর বুক স্টল ; কে সিং ; নন্দীকিশোর (নান্‌কা) ; শম্ভু মণ্ডল ; মহেন্দ্র মণ্ডল—কলেজ স্ট্রীট (পাতিরামের সামনে ফুটপাতের স্টল-গুলোতে)
- ☐ মা কালী বুক স্টল—শ্রীমানি মার্কেটের বিপরীতে বিধান সরণীতে
- ☐ ঘোষ বুক স্টল—বিধান সরণী (বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে)
- ☐ রাণা'র দোকান—কলেজ স্কোয়ারের উল্টো দিকে
- ☐ দমদম স্টেশন ; শিয়ালদহ স্টেশনের স্বপন, পঙ্কজ ও চঞ্চলের বুক স্টল
- ☐ অয়নায়ন—গড়িয়াহাট মোড়
- ☐ রায়গঞ্জ সাইন্স ক্লাব

বি-ও-বি'র কথা

বিজ্ঞান মনীষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার

প্রায় অতিক্রান্ত 1987, যা একটি ত্রিশতবর্ষপূর্তি ও অনেকগুলো শতবর্ষ উদ্‌যাপনের যোগফলে তৈরি এক অর্থময় বছর—বিজ্ঞানের ইতিহাসে যার প্রত্যেকটি, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমেই স্মরণীয়, নিউটনের "প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা" প্রকাশের এ হ'ল তিনশতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার বছর। নিউটনের গতিসূত্রই বলবিদ্যার অ-আ-ক-খ। বলবিদ্যার সজ্ঞান প্রয়োগ মানব সভ্যতাকে নিঃসন্দেহে পরিপুষ্ট করেছে। একথা অবশ্য ঠিক যে পরবর্তী সময়ে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও আপেক্ষিকতা-বাদ তত্ত্বের যৌথ প্রভাবে নিউটনীয় গতিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ সংশোধিত হয়েছে; তার প্রয়োগসম্ভাবনার সীমাবদ্ধতার কিছু দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তবুও আমাদের সদা-পরিচিত জগতের সমস্ত 'ম্যাক্রো'-পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে নিউটনীয় তত্ত্বের সাফল্য কার্যত আজও অম্লান। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যে এই 1987 সালই হ'ল নোবেলজয়ী পদার্থবিদ এরউইন শ্রএডিংগার-এর জন্মশতবর্ষ—যিনি ছিলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অন্যতম পথিকৃৎ। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক সমীকরণের অবদান ছাড়াও তাঁর লেখা "What is Life" গ্রন্থটি জীবপদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি আলোক-সন্ধানী প্রচেষ্টা। একশ বছর আগে 1887 সালে মাইকেলসন ও মোরলি তাঁদের পরীক্ষামূলক গবেষণায় তাৎপর্যপূর্ণ কিছু ফললাভ করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে আলবার্ট আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হয়েছিল। ঘুরিয়ে বলা যায় যে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের পরীক্ষামূলক সমর্থনের এটি হ'ল ভিত্তি-শতবর্ষ।

প্রথিতযশা, প্রয়াত ভারতীয় গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজন-এর জন্ম হয়েছিল 1887 সালের 22 ডিসেম্বর তারিখে। রামানুজন ছিলেন এবং রয়েছেন আজও গণিত-জগতের এক অবিস্মরণীয় বিস্ময়। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল 1920 সালের 26 এপ্রিল। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি গণিতের ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদান রেখে গিয়েছেন। চলতি পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্পূর্ণ বাইরে থেকেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা হ'য়ে যাঁরা এসেছিলেন (শুধু ব্যক্তি হিসেবে নয়), তাদের একজন রামানুজন। দারিদ্র্যের গৌরবায়ন নিশ্চয়ই আমরা চাইবো না। তবু, রামানুজন-এর জন্ম ও জীবন আমাদের শেখায় যে অন্তত গণিত প্রতিভার বিকাশে দারিদ্র্যই শেষ ও চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক নয় (অবশ্য কোনো ব্যতিক্রম দিয়ে নিয়মকে বিচার করা নিশ্চয়ই অনুচিত); শেখায় যে আজও প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গীভূত না হয়েও কৃষ্টি এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে, সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে বিশাল ও মহান অবদান সৃষ্টি সম্ভব। আমাদের মত নুয়ে-পড়া-মেরুদণ্ডের জাতির পক্ষে এটা বোঝা খুবই জরুরী। আগামী 1988 সালটিও ভারতবর্ষের বিজ্ঞানকর্মীদের অনুপ্রেরণা লাভের আর একটি বৎসর—কারণ সেটি হ'ল আরেকজন যশস্বী ও একমাত্র নোবেলজয়ী ভারতীয় পদার্থবিদ সি. ভি. রমন-এর জন্ম-শতবর্ষ, যাঁর কার্যকালের কেন্দ্রবিন্দুটি অবস্থিত ছিল এই কলকাতায়।

কৃতীজনদের মহান অবদানের সময়োচিত স্বীকৃতি নিশ্চয়ই সুস্থ সংস্কৃতি—যা আমরা চাই, যার জন্য আমাদের লড়াই। অতীতকে অবহেলা করে, ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে ভবিষ্যতের দিকে পা-বাড়ানো অসম্ভব। শতবর্ষ উদ্‌যাপনের নামে ব্যয়বহুল হই-চই ও নিছক অনুষ্ঠানসর্বস্বতা আমরা অবশ্যই চাই না—কিন্তু, যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা-প্রদর্শন নিশ্চয়ই সমর্থন করি। কারণ, আমরা মানি যে সনিষ্ঠ স্মরণ আমাদের মহৎ অনুসরণ-এর প্রেরণা যোগায় ও স্বনির্ভরতার দীক্ষা দেয়।

শেষে আরেকটি কথা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল ধারার বাইরে থেকে চলতি ব্যবস্থার অঙ্গীভূত না হয়েও বিজ্ঞানের জন্য, প্রগতির জন্য, শান্তির জন্য, এককথায় সমাজ-সভ্যতা-মানবতার জন্য অনেক নাম-হারা বিজ্ঞান-কর্মী ও মানুষ লাগাতার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন এবং যাচ্ছেন—হতে পারে যে পাদপ্রদীপের আলোয় সেই অগণিত অচেনা মানুষদের আমরা কোনোদিনও পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে পারবো না! হয়তো তাঁদের তত্ত্ব-চিন্তা-কর্মের গায়ে নোবেল জয়ের গৌরব নেই, নেই প্রতিষ্ঠার সৌরভও। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রেই থেকে যায় তাঁদের কাজের অপরিসীম প্রায়োগিক-মূল্য—যা টের পান পরবর্তী সব যুগের মানুষ। তাই এইসব স্বীকৃত, অলোকসামান্য প্রতিভাধর ও কীর্তিমান মানুষদের স্মরণ করবার সময়ে যেন আমরা বিস্মৃত না হই সেই অপরিচিত, নাম-না-জানা মানুষদের অতি ছোট-ছোট অবদানের ভূমিকা ও গুরুত্ব। বরং মনে রাখতে হবে যে এ দুটি ধারার সমন্বয় ও সংযুক্তি থেকেই বরাবর জন্মায় মানুষের সংস্কৃতির সমষ্টিগত উত্তরাধিকার।

সুব্রত ভট্টাচার্য্য
22 ডিসেম্বর, 1987

সবুজ সম্ভাবনা

সুস্থ মানবিক আর প্রাকৃতিক পরিবেশ—এই হল 'সবুজ দল'-এর রাজনীতির লক্ষ্য। পশ্চিম জার্মানীর গ্রীন পার্টির এই পরিচিতিটি বি-ও-বি'তে প্রকাশিত হবে ধারাবাহিক ভাবে। তারই প্রথম অংশ।

[পশ্চিম জার্মানীর গ্রীনদের সম্পর্কে জানার ইচ্ছা বেশ কিছুদিন ধরেই বন্ধুরা প্রকাশ করছেন, কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল তথ্যের ঘাটতি। এরই মধ্যে হাতে এল "গ্রীন পলিটিক্স—দ্যা গ্লোবাল প্রমিস" বইটি। লেখক হলেন ফ্রিত্‌জফ্‌ কাপ্রা এবং শার্লেন স্প্রেত্‌ন্যাক। আমেরিকান বিকল্প সংস্কৃতির আন্দোলনে দুজনেই অল্পবিস্তর পরিচিত এবং বিতর্কিত। কাপ্রার "তাও অফ ফিজিক্স" বইটি সম্পর্কে তো রীতিমত বিতর্ক প্রগতিশীল মহলে। আমাদের আলোচ্য বইটিও অবশ্যই বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। সাবজেক্টিভ ব্যাখ্যায় বামপন্থার বিরোধিতা রয়েছে গোটা বইটি জুড়েই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের মনে হয়েছে যে পশ্চিম জার্মানীর সবুজদের সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচয়ের পক্ষে বইটি উপযোগী। আমরা যা করছি তা হল, বইটির একটি অতি সংক্ষেপিত ভাবানুবাদ—অধ্যায়ভিত্তিক ঢঙে। প্রথম কিস্তিতে ভূমিকাটি প্রকাশ করা হল।]

1983 সালের 22-শে মার্চ পশ্চিম জার্মানীর রাজধানীর প্রধান রাজপথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। মূল মিছিলে মানুষের সংখ্যা সাতাশ। এঁদের মধ্যে আছেন একজন নার্স, একজন দক্ষ শ্রমিক, একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি, একজন রাজমিস্ত্রি, কয়েকজন শিক্ষক, একজন পশুচিকিৎসক, একজন অবসরপ্রাপ্ত কম্পিউটার প্রোগ্রামার, তিনজন ইঞ্জিনীয়ার, একজন বৈজ্ঞানিক, একজন পুস্তকবিক্রেতা, একজন স্থপতি, একজন সাংবাদিক, একজন কৃষি-অধ্যাপক এবং একজন আইন ব্যবসায়ী। মিছিলের সবাই পড়ে আছেন উজ্জ্বল অথচ সাধারণ জামা-কাপড়, মাঝে রয়েছে একটি বিরাট রবারের গোলাকৃতি পৃথিবীর মডেল আর ব্ল্যাক ফরেস্ট অঞ্চলের পরিবেশ দূষণের কোপে পড়ে শুকিয়ে যাওয়া একটি গাছের ডাল। শোভাযাত্রার সাথে রয়েছেন বিভিন্ন নাগরিক আন্দোলনের তথা নানান দেশের প্রতিনিধিরা। মিছিলটি ক্রমশ জার্মান জাতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ বুণ্ডষ্ট্যাগ-এ ঢুকল। মিছিলটি অভিনব এই কারণে যে বিগত ত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম একটি নতুন দল বুণ্ডষ্ট্যাগে প্রবেশ করে ডানদিকে বসে থাকা রক্ষণশীল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট এবং বামদিকে বসে থাকা উদারনৈতিক বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে জায়গা করে নিল। এই মানুষরাই হলেন "ডী গ্রুনেন" বা দ্যা গ্রীনস।

যাঁরা "সবুজ" তাঁরা বলেন যে তাঁরা হলেন 'দল-বিরোধী দল', অন্য অর্থে বিভিন্ন ধরনের নাগরিকদের আন্দোলনের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর। তাঁরা মনে করেন বর্তমান পৃথিবী যে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা-জনিত অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় আক্রান্ত তা কখনই এক একটি বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। কোনও আগে-পরে সমাধানের চেষ্টার ব্যাপার নয়। প্রতিটি সমস্যা ও তার সমাধান একে অপরের সাথে গভীরভাবে বিজড়িত এবং অবশ্যই তার চরিত্র আন্তর্জাতিক। তাঁদের মতে প্রতিষ্ঠিত যান্ত্রিক সভ্যতা তথা চালু শিল্প-নির্ভর সমাজই তৈরী করেছে এক আর্থিক ও আত্মিক দারিদ্র্য। গ্রীনসদের তুলে ধরা জরুরী সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না কোনও প্রতিষ্ঠিত দল তথা শাসনব্যবস্থা। ফলে তাঁদের বিক্রুপাত্মক কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে আরো শাণিত।

কোন্ ধরনের মানুষ আছেন গ্রীনসদের মধ্যে? উত্তরটা আগ্রহ বা কৌতূহল উদ্দীপক। কারণ মতাদর্শ বা পেশাগত ভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে নানান ধরনের কাজ করছেন এখানে। একদিকে যেমন রয়েছেন ইকলজিস্টরা, তেমনিই রয়েছেন নিউক্লিয়ার শক্তি বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারিরা, আছেন শান্তি আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন তথা তৃতীয় বিশ্ব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন এমন কর্মীরা। মতাদর্শর দিক থেকে ভাগ করলে স্বপ্নদ্রষ্টা/সামগ্রিক চিন্তাবাদী (Visionary /Holistic) গ্রীনরা, ইকো-গ্রীনরা, শান্তি আন্দোলনকারী গ্রীনরা এবং মৌলিক পরিবর্তনবাদী বামপন্থী গ্রীনরা—সবাইয়েরই অবদান রয়েছে সামগ্রিক আন্দোলনে।

সবুজ রাজনীতিতে প্রথমেই এটা স্বীকার করে নিতে হয় যে আমরা ক্রমশ ডুবে যাচ্ছি এক বহুমুখী পৃথিবীব্যাপি সমস্যার পঙ্কিল আবর্তে যা আমাদের জীবনের সমস্ত দিককেই গ্রাস করছে। আমাদের স্বাস্থ্য এবং জীবনধারণের উপায়, আমাদের পরিবেশের উৎকর্ষ, আমাদের সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, প্রযুক্তি—শেষ বিচারে আমাদের অস্তিত্ব, কোন কিছুই বাদ যাবে না।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রায় 50 হাজার নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড একে অন্যের দিকে (নাকি নিজের দিকেই) তাক করে সাজান রয়েছে যা আমাদের সুন্দর সবুজ পৃথিবীকে বেশ কয়েকবার ধ্বংস করে ফেলতে পারে। তবুও অস্ত্র প্রতি-যোগিতা দ্রুতগতিতে এগিয়েই চলেছে। একই আকাশের নীচে যেখানে প্রতিদিন সমর খাতে খরচ প্রায় একশ কোটি টাকা সেখানে প্রতি বছর প্রায় পনের লক্ষ মানুষ স্রেফ না খেতে পেয়ে মারা যায়, অর্থাৎ প্রতি মিনিটে বত্রিশ জন, যাদের অধিকাংশই শিশু।

উন্নয়নশীল দেশে অস্ত্রের জন্য খরচ স্বাস্থ্যরক্ষাজনিত খরচের তিন গুণেরও বেশী। গোটা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদদের প্রায় অর্ধেক নিযুক্ত অস্ত্র নির্মাণ গবেষণায়, পাশাপাশি, একশ জনে পঁয়ত্রিশ জন মানুষ পান না পানের উপযুক্ত নিরাপদ পানীয় জল। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের

সীমা বিপজ্জনকভাবে নির্দিষ্ট হয়ে আসছে। আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার বদলে জমা করছে এখানের বদলে সেখানে এবং সেখানের বদলে এখানে। তাঁরা ভুলে যান যে একই ইকোসিস্টেমের মধ্যে "অন্য কোথাও" বলে কোন জায়গা হয় না। আধুনিক ওষুধই সময় সময় আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, আর প্রতিরক্ষা দপ্তর হয়ে ওঠে জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে এক ভীতিকর জিনিস।

আমাদের প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকরা কোনও দিনই জানতে পারবেন না ঠিক কি ভাবে, কোথা থেকে শুরু করতে হবে এই ধ্বংসমুখী জীবনধারার চাকাটিকে সুস্থ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে ঘুরিয়ে দেবার কাজ। তাঁরা ক্ষতি কমাবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিয়ে তর্ক তোলেন। তর্ক তোলেন অল্প-মেয়াদী প্রাযুক্তিক ও অর্থনৈতিক দাওয়াইগুলির আপেক্ষিক সুবিধা অসুবিধা নিয়ে। তাঁরা বোঝেন না যে আমাদের সময়ের বড় বড় সমস্যাগুলি একই সঙ্কটের বহুমুখী রূপ, অর্থাৎ আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সমস্যাগুলি কখনই ভালভাবে বোঝা যাবে না যদি বিচ্ছিন্ন-ভাবে সেগুলিকে দেখা হয়, অথচ মজার ব্যাপার হল যে সরকারী সংস্থা তথা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সেভাবেই দেখতে শেখায়। এই ধরনের প্রচেষ্টাগুলি সমস্যা সমাধানের বদলে সামাজিক তথা ইকলজিভিত্তিক জটিল জালের মধ্যে তাদেরকে একদিক থেকে অন্যদিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। গ্রীনরা মনে করেন সমাধান লুকিয়ে আছে এই জালের কাঠামোর পরিবর্তনের মধ্যেই এবং তার অর্থ হল ধারণা, মূল্যবোধ এবং আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এক গভীর পরিবর্তন।

পৃথিবীব্যাপী যে সঙ্কট তা থেকে মুক্ত হবার প্রথম পদক্ষেপ হল এক নতুন 'প্যারাডাইম'কে স্বীকৃতি দেওয়া অর্থাৎ বাস্তবকে দেখার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করা। এই পরিবর্তনের শুরু এখনই দৃশ্যমান এবং আশা করা যায় যে এই দশককে তা প্রভাবিত করবে। যে প্রতিষ্ঠিত প্যারা-ডাইমটি এখন পিছু হটছে তা বেশ কয়েক শ' বছর ধরে আমাদের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে এসেছে, গড়ে তুলেছে আধুনিক পশ্চিমী সমাজকে, যার ছোঁয়াচ পড়েছে গোটা দুনিয়া জুড়েই। গ্রীনরা দেখিয়েছেন যে এই প্যারাডাইম থেকে গড়ে উঠেছে যে মূল্যবোধ ও চিন্তাধারা তাকে ছোট করে প্রকাশ করলে অন্তত কয়েকটি বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ মোটা দাগের ভাষায় লিপিবদ্ধ করে ফেলা যায়।

(ক) এই বিশ্বপ্রকৃতি হল এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা টুকরো টুকরো মৌলিক বস্তুপুঞ্জর সমাহারে তৈরী।

(খ) মানুষের শরীর এক উন্নত মানের যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।

(গ) সমাজ-শরীরের প্রাণবস্তু হল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অস্তিত্বের জন্য পারস্পরিক সংঘাত।

(ঘ) অর্থনৈতিক ও কারিগরী দক্ষতার বিকাশের মধ্য দিয়ে সীমাহীন বস্তুগত উন্নতিই মানুষের মূল লক্ষ্য।—

এবং শেষ, যদিও সর্বশেষ নয়,

এক বিশ্বাস—

সেই সমাজই প্রকৃতির প্রাথমিক নিয়ম মেনে চলে যে সমাজে নারীরা পুরুষের অধীন।

গীনদের মতে এই ধারণাগুলির স্থূলতা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে এবং মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন নিবিড়ভাবে অনুভূত হচ্ছে। বিশ্ববীক্ষা পরিবর্তনের এই যে প্রয়োজনীয়তা তার একটি অঙ্গ হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিশেষত পশ্চিম জার্মানীতে সবুজ রাজনীতির বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। রাজনীতির প্রাচীন এবং ক্ষয়ে যাওয়া ক্ষেত্রে ডানপন্থা এবং বাম-পন্থার সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে ক্রমশ উপরে উঠে আসছে এক নতুন চিন্তার আলোক—সবুজ রাজনীতি, যা এক ইকলজিভিত্তিক সর্বাত্মক (Holistic) এবং নারীবাদী আন্দোলন। এই নতুন রাজনীতি যা বলতে চায় তার কয়েকটি সাধারণ দিক হল—

(ক) এই বিশ্বে যা ঘটছে তা একে অপরের সাথে জড়িত এবং পরস্পর নির্ভরশীল।

(খ) প্রকৃতির আবর্তন পদ্ধতির মধ্যে ব্যক্তিমানুষ তথা সমাজ গভীরভাবে গ্রথিত।

(গ) পুরুষকর্তৃত্ব হল অন্যায় এবং ধ্বংসাত্মক এবং এর উন্মোচন প্রয়োজন।

(ঘ) সামাজিক দায়িত্ববোধ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

(ঙ) এবং সর্বোপরি এমন এক সুস্থ, মানবিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে যা ইকলজিভিত্তিক, বিকেন্দ্রীভূত, সমদর্শী এবং নমনীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক। এমন এক ব্যবস্থা যেখানে মানুষের নিজের জীবনের উপর অর্থপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

সহযোগিতাভিত্তিক এক দুনিয়া গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে সবুজ রাজনীতি প্রকৃতির, ব্যক্তি মানুষের, সামাজিক গোষ্ঠীর এবং জাতিগুলির উপর শোষণের শেষ দেখতে চায়।

সমস্ত ধরনের হিংসা বিরোধিতায় গ্রীনরা সোচ্চার। সমাজের মধ্যে বহুমুখী ভাবধারার প্রচেষ্টায় এক উন্নত সাংস্কৃতিক জীবনে বিশ্বাসী তাঁরা। জ্ঞান এবং সমবেদনাপূর্ণ এক বিকাশে আগ্রহী সবুজ রাজনীতি হল প্রাচীন পৃথিবীতে এক নতুন বসন্তের ইস্তাহার।

সুমিত বিশ্বাস
সুজয় মুখার্জী
সুরঞ্জন কর

জ্ঞান : অজ্ঞান, বিজ্ঞান

স্বরূপ গুপ্ত

অলকদাকে আমরা অনেকে বিজ্ঞানদা বলে থাকি। কেউ কেউ মস্করা করে জ্ঞানদা বলতেও ছাড়ে না অবশ্য। তাতে অলকদাকে কোনদিন রাগ করতে দেখিনি। সে যাই হোক, অলকদার এহেন নামকরণের গূঢ় রহস্যটা হল এই যে, তিনি বিজ্ঞানের স্বরূপ গতি-প্রকৃতি নিয়ে সদাই মুখর। দীর্ঘ-দিনের চিন্তাভাবনা ওঁর এ বিষয়ে।…কিন্তু লেখার কথা বললেই অলকদা এড়িয়ে যান, বলেন—এ বিষয়ে বই-এর তো কোন অভাব নেই। কিন্তু সেসব বই যে বাংলায় নয় এবং ক্বচিৎ সর্বজনবোধ্য একথা বলেও বিজ্ঞানদার মগ্নতা কাটানো যায় না। তবে একটা সুবিধে কি, প্রসঙ্গ উঠলেই বিজ্ঞানদা কথা বলেন, আবেগের সঙ্গেই বলেন।

আমাদের বৈঠকে অলকদা তথা বিজ্ঞানদা ধূমকেতুর মত হঠাৎ কোন কোনদিন হাজির হন। আর যেদিন হাজির থাকেন, সেদিন একাই আসর মাত করে রাখেন। সেদিনও তেমনি হঠাৎ হাজির হয়ে উনি অভিযোগ করলেন, তোমরা সব কি যা-তা ছাপছো বলতো, বিজ্ঞানের মর্মবস্তু নিয়ে সহজ সরল লেখা একটাও চোখে পড়ল না! কী তোমরা করতে চাও—বিপ্লব? আন্দোলন? যুদ্ধ-বিরোধিতা? বিজ্ঞানকর্মীদের ট্রেড-ইউনিয়ন? নারীমুক্তি?…ফচকে কে একজন মন্তব্য করে—কেন বিজ্ঞানদা, এসব কি বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না?

দপ্ করে জ্বলে উঠলেন বিজ্ঞানদা—পড়বে না কেন, আলবাৎ পড়ে, আরও তো কত কিছুই পড়ে বিজ্ঞানের আওতায়। বিজ্ঞান কথার অর্থ বোঝ? ইংরেজী সায়েন্স কথাটার ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ বিজ্ঞান হয় না, কি আর করা যাবে। সায়েন্স শব্দের অর্থ হ'ল জ্ঞান বা নলেজ, আর বিজ্ঞান মানে হ'ল বিশেষ জ্ঞান। মোটামুটি সম্পূর্ণ একটি আধুনিক সংজ্ঞা দিতে হলে সায়েন্সকে বলা যায় চারটি লক্ষণযুক্ত জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রবিশেষ—প্রথমত তা পরীক্ষিত প্রমাণিত সত্য বা নিরীক্ষালব্ধ ঘটনাসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত, দ্বিতীয়ত তা পারম্পর্যে বিন্যস্ত, তৃতীয়ত, তা প্রায়শই সাধারণ সূত্রাকারে প্রকাশযোগ্য, এবং চতুর্থত তা নতুন সত্যানুসন্ধানের যুক্তিনির্ভর পন্থার হদিস জোগায়।…কিন্তু আজকের দিনে সায়েন্স তথা বিজ্ঞানের তাৎপর্য আরও ব্যাপক, আরও গভীর, সরলীকৃত কোন সংজ্ঞাতেই তা ধরা পড়ে না।…

—উরি বাবা! এই বুঝি সরলীকৃত সংজ্ঞা? প্রতুলের কথাটা স্বগতোক্তির মত শোনায়। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বিজ্ঞানদা বলতে থাকেন—বিজ্ঞান হ'ল সত্য, বিজ্ঞান শৃঙ্খলা, সংগঠনা; বিজ্ঞান হ'ল প্রগতি, পরিবর্তন, পরিমিতি, প্রশ্ন, পরীক্ষা, প্রকল্পায়ন, প্রকৃতি, প্রকৌশল, পদ্ধতি; বিজ্ঞান হ'ল শিল্প, স্বাধীনতা, সংগ্রাম, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সংস্কৃতি, সরলতা, শান্তি, শক্তি, সৌন্দর্য্য, সংগ্রহ, সম্পর্ক, সম্পূর্ণতা, সংযোগ, সাফল্য, সাধারণীকরণ, সংজ্ঞা; বিজ্ঞান হ'চ্ছে বিশ্লেষণ, বিবর্তন, বৈচিত্র্যায়ণ, বাস্তবতা, বিশুদ্ধতা, বিকেন্দ্রীকতা; বিজ্ঞান হ'চ্ছে দর্শন, ইতিহাস, অস্তিত্ব, মনুষ্যত্ব, নতুনত্ব, ছন্দ, কর্ম, দ্বন্দ্ব, কার্যকারণবিধি, জিজ্ঞাসা, উত্তর, অনুসন্ধিৎসা, নিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিকতা, ক্রিয়াশীলতা, গতি, ত্বরণ, অখণ্ডতা, মিলন; বিজ্ঞান সর্বদা ইতিবাচক, যা নয় তা হয়ে ওঠা, জীবিত হয়ে ওঠা…

একটা মন্তব্য শোনা গেল—বিজ্ঞান হ'ল বিজ্ঞান।

—ডিকশনারীতে আর শব্দ আছে?—আরও একটা মন্তব্য।

হঠাৎ থেমে গেলেন বিজ্ঞানদা।

অস্বস্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত। সুমিতা উদ্ধার করল আমাদের।

আগ্রহী প্রশ্ন ওর—কিন্তু আমি বুঝলাম না, বিজ্ঞান কি করে হয়—ইতিহাস, দর্শন, অস্তিত্ব, মনুষ্যত্ব…

প্রশান্তি ফিরে আসে বিজ্ঞানদার চোখে-মুখে, ব্যাখ্যা করেন—মানুষের ইতিহাস মোটের উপর এগিয়ে চলার ইতিহাস, সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাস। তাকে আবার ধারণ করে রাখে উৎপাদন। কাজেই সামাজিক ইতিহাসের চালিকাশক্তি নিহিত উৎপাদন-প্রকরণ ও উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর ও সব মানুষদের সম্পর্কের মধ্যে। বিজ্ঞানের সামগ্রিক জ্ঞান যেহেতু উৎপাদন প্রকরণের উন্নতিসাধনে নিয়োজিত, অতএব মানুষের সভ্যতার ইতিহাস—বিজ্ঞানেরও ইতিহাস। আবার বিজ্ঞান সর্বাগ্রে একটা দর্শন, এবং তার পর কৃৎকৌশল। প্রকৃতিকে, মানুষকে, জীবনকে দেখার ভঙ্গী বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টেছে। আর এই ক্রম-পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীই সম্ভব করেছে বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতি। আমি বিজ্ঞানকে যতভাবে বর্ণনা করলাম, তার সবগুলো একসঙ্গে কোন মানুষের চিন্তাজগতে ক্রিয়াশীল হলে তবেই একটা মানুষ হতে পারে সম্যক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী।

রহমান আমাদের বৈঠকে প্রায় নবাগত। বিজ্ঞানদার কথাগুলি ও প্রায় গিলছিল। উৎকণ্ঠার সঙ্গে সে প্রশ্ন করে—একটু যেন বাড়াবাড়ি শোনালো আপনার কথা। তাছাড়া, আপনি বেমালুম এড়িয়ে গেলেন যে বিজ্ঞান হল সৃষ্টি, আবার বিজ্ঞান ধ্বংস, বিজ্ঞান কেন্দ্রিকতা এবং যুদ্ধ, শোষণ-অত্যাচার-নিপীড়ন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার যথেষ্ট খেয়াল ছিল সেদিকে। ইচ্ছে করেই আমি বলিনি যে বিজ্ঞান সৃষ্টি বা ধ্বংস। শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি হয় না; বস্তু বা শক্তির রূপান্তর ঘটে মাত্র। এই বৈজ্ঞানিক সত্যের খাতিরেই আমি বলিনি বিজ্ঞান সৃষ্টি; একই কারণে ধ্বংসও বিজ্ঞান নয়, যুদ্ধও নয় এবং একমুখী কেন্দ্রিকতাও নয় যা জন্ম দেয় একনায়কতন্ত্রের, স্থির স্থবির করে তোলে সব কিছু চিন্তা থেকে সমাজব্যবস্থা। যার পরিবর্তন নেই, বা বলা ভালো পরিবর্তন স্বীকৃত নয়, তা অবিজ্ঞান। আমি বলেছি

বিজ্ঞান সাধারণীকরণ, এর মধ্যে একটা কেন্দ্রিকতার আভাস আছে ঠিকই। কিন্তু এ কেন্দ্রিকতা রিজিড নয়, একই সঙ্গে তা ব্যতিক্রমও সন্ধান করে। বহু তথ্য থেকে একটা সাধারণ নিয়ম খুঁজে বের করা যেমন বিজ্ঞানে স্বীকৃত, তেমনি ব্যতিক্রমী তথ্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে নতুন নিয়মের সন্ধানও বিজ্ঞান নিরন্তর করছে। বিজ্ঞান সৃষ্টি নয় বরং বিকাশ, বিবর্তন। আর বিকশিত বা বিবর্তিত হবার পথে মাঝে মাঝে আসে ক্রান্তিমুহূর্ত, তখন ঘটে উল্লম্ফন ; অনেক সময় সেটাকেই ভুলভাবে সৃষ্টি হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

রহমান তবুও তর্ক তোলে—কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পুরোটা পেলাম না। আমরা কি দেখছি না, বিজ্ঞানের ইতিহাস ক্রমাগত উন্নততর যুদ্ধাস্ত্র, ধ্বংসের হাতিয়ার তৈরীর ইতিহাস? বিজ্ঞান কি এক শ্রেণীর মানুষের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে অন্য শ্রেণীর মানুষকে, শুধু একটিমাত্র দেশেই নয়, বলতে গেলে সারা পৃথিবীর সংখ্যাগুরু মানুষকে, দাবিয়ে রাখার হাতিয়ার হয়ে ওঠে নি? বিজ্ঞান কি মানুষকে তার শ্রম থেকে, অপরাপর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে না? বিজ্ঞান কি এলিটিস্ট নয়? বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের নামেই কি আজ পরিবেশ বিধ্বংসী সম্ভাবনার সম্মুখীন নয়? অটোমেশন ও নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি কোন গণতান্ত্রিকতা, সম্মিলন, শান্তি, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে?—রহমানকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

রহমানের উত্তেজনা বিজ্ঞানদাকে বিচলিত করে না, বলেন—হ্যাঁ। আজকের পৃথিবীতে চারপাশে তাকালে এরকম একটা তত্ত্ব, যে বিজ্ঞান হ'ল হিংসা, যুদ্ধ, শোষণ অত্যাচার নিপীড়ন, প্রতিক্রিয়াশীলতা—বেশ যুৎসই মনে হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এ তত্ত্ব ঠিক নয়। পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ, শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার কি আগের থেকে বেশী এখন? আমি বলব—না। এখন কি সমঝোতা-সহিষ্ণুতা আগের চেয়ে কমেছে? মনে তো হয় না। শত শত গোষ্ঠীর বা দেশের মধ্যে শত শত যুদ্ধ কি নিরন্তর ঘটতো না আগে? বলতে পার, সংখ্যার বিচারে কম হলেও ধ্বংসের বিচারে আজ যুদ্ধের ব্যাপকতা অনেক বেশী। কিন্তু আসল কথা হ'ল বিজ্ঞান কি এসব যুদ্ধ বা ধ্বংস অতিক্রম করে যাবার ইঙ্গিত দেয় না? আমার মতে, অবশ্যই দেয়। আর তারই জন্য বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে হবে—যেতে হবে ল্যাবরেটারীর বাইরে। মানুষের কাছে মানুষের সঙ্গে, প্রকৃতির মধ্যে। মাঝে এদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মাত্রা বেড়ে গেছিল মাত্র। এখন আবার এই সম্মিলন ঘটার পালা। তাই দেখছো না, পৃথিবীর মানুষ উত্তাল, নিউক্লিয় অস্ত্র বিরোধী আন্দোলনে? পরিবেশ দূষণের মতো টেকনিক্যাল বিষয়কে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠছে রাজনৈতিক প্রোগ্রাম, পার্টি? অরগ্যানিক এগ্রিকালচারের বিষয়ে উৎসাহ বাড়ছে? সত্যি কথা, এখনও এগুলো পৃথিবীর রূপ পাল্টে দেবার মত ব্যাপকতা পায় নি, কিন্তু সেই প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে গেছে।

প্রতুল নিস্পৃহভাবেই বসে ছিল। এবার সেও প্রশ্ন তোলে—আপনার বক্তব্য কেমন যেন গুলিয়ে দিচ্ছে সব। আপনি কি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই পুরনো আপ্তবাক্যই আওড়াচ্ছেন না যে বিজ্ঞানের নিজস্ব কোন রূপ, গতি বা আকার নেই, কে কি উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করছে তাই দিয়েই ঠিক হয় তার স্বরূপ?

বিজ্ঞানদা—না, আমি মোটেই তাই বলতে চাই না। আমি বরং বলতে চাই, যে বিজ্ঞানকে আংশিক বা খণ্ডভাবে বিশেষ বিশেষ মানুষ বা গোষ্ঠীর ক্ষুদ্রস্বার্থ-সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে—তা আদৌ বিজ্ঞান নয়। সামগ্রিকভাবে যদি বিজ্ঞানকে বোঝার প্রয়াস থাকতো, তাহলে অনেক অপপ্রয়োগই রোধ করা যেতে পারতো। একটা পরিচিত উদাহরণের সাহায্য নিই : আগুন দিয়ে অন্ধকার তাড়াবার মশালও জ্বালা যায়, আবার ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংসও করা যায়। কৌশল যতই আধুনিক হোক উদ্দেশ্য দিয়েই বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব বুঝতে হবে। মশাল জ্বালিয়ে বাড়ীঘর পোড়ানো আর লেজার রশ্মি দিয়ে ধ্বংস দুটোই অপরাধীর কাজ। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, বিজ্ঞান কতকগুলি কৌশল বা ফর্মুলার সমষ্টিমাত্র নয় ; নীতিবোধ, মূল্যবোধ, মানবিকতাবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে তা আর বিজ্ঞান থাকে না। অথচ সেটাই এখন ঘটছে প্রচুর, তাই এ হতাশা।…বিজ্ঞানই পারে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ বন্ধ করতে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যেই একটি সংশোধনী প্রক্রিয়া আছে। সেটাই আমাদের পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে—বাঁচাবেও—বীজাকারে তার সূত্রপাত ঘটেছে। তবে একথাও ঠিক যে এটা ঘটবার জন্য আরও অনেক অপেক্ষা করতে হবে—সচেতন প্রয়াস চালাতে হবে, যাতে পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার একটা কালচার গড়ে ওঠে। তার জন্য অবশ্য প্রতিটি মানুষেরই বিজ্ঞানে ডিগ্রী নেবার দরকার নেই, তেমনি অধিকাংশ তথাকথিত বিজ্ঞানীরই মানুষ-মনস্ক হয়ে ওঠার দরকার আছে। একমাত্র বিজ্ঞানের মধ্যেই, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যেই অংশ তথা খণ্ড, বিকৃতি তথা একপেশেমি কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা নিহিত আছে। প্রথাগত বিজ্ঞানচর্চার চৌহদ্দির বাইরে যার চর্চা এখনও গৌণ।

কথা থামিয়েই হঠাৎ বিজ্ঞানদা ব্যাগ হাতে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন—আরে এত রাত হয়ে গেল, পলিটার শরীর ভালো নেই…আজ চলি…

বিজ্ঞানদার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে—নাম রেখেছেন অক্সিজেন ও পোলোনিয়াম। সুমিতা তা জানে না। সে বলে—আচ্ছা বিজ্ঞানদা—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা এখানে বহুবার শুনেছি, কোনদিন জিজ্ঞাসা করার সাহস হয়নি, আমি আর্টসের ছাত্রী কিনা—সবাই যদি হাসাহাসি করে! একটু বুঝিয়ে বলবেন ব্যাপারটা?

যেতে যেতেই বিজ্ঞানদা উত্তর দেন—ঐ তো, যা সবচেয়ে ফাণ্ডামেণ্টাল এবং সঠিক কেউই জানি না, তাই নিয়েই আমরা সবজান্তার ভাব দেখাই।…আচ্ছা সুমিতা তোমার কথাটা মনে রইল, আজ আমাকে যেতেই হবে।…

গণবিজ্ঞান আন্দোলন ও মহিলাদের সংগ্রাম

আজকের গণবিজ্ঞান আন্দোলন বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ ও পদ্ধতির কোনো মৌলিক সমালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। পুরুষ কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতাও এর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই মহিলাদের সংগ্রাম থেকে এই আন্দোলন বিযুক্ত। এই বিযুক্তির অবসান খুব জরুরী।

মহিলাদের সংগ্রামের সঙ্গে আজকের গণবিজ্ঞান আন্দোলনের যোগাযোগ খুবই সামান্য। কারণ এই আন্দোলন প্রচলিত বিজ্ঞানের মতাদর্শগত বিষয়বস্তুর অনেকটাই আত্মস্থ করেছে, তাই প্রচলিত বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ব্যাপারে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অনীহা প্রকাশিত হচ্ছে।

'গণবিজ্ঞান'-এর অর্থ বিভিন্নভাবে করা যায়। এটা শুধুই বিজ্ঞানের বহুল প্রচার হতে পারে, আবার মানবকল্যাণের জন্য নতুন বিজ্ঞানের সৃষ্টিও হতে পারে। অথবা এটা এমন এক বিজ্ঞানের সূচক হতে পারে যা তার উদ্ভবে, বিষয়বস্তুতে, এবং ব্যবহারে স্থিতাবস্থার বিরোধিতা করবে। অন্য কথায়, গণবিজ্ঞান হল এমনই এক বিজ্ঞান যা আবশ্যিকভাবে পুঁজিবাদী ও পুরুষকর্তৃত্ববাদী সামাজিক ব্যবস্থার স্বার্থ ও চাহিদার বিরুদ্ধে কাজ করবে।

এ ব্যাপারে কোন বিতর্কই নেই যে আধুনিক বিজ্ঞান হলো পুঁজিবাদী সমাজেরই ফসল এবং এরই একটি অংশ। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিরই একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ।

যেহেতু প্রচলিত বিজ্ঞান কখনই পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ব্যাপারে কোন বাধা দেয় না বা আপত্তি তোলে না, তাই এর গতিপথ, মর্মবস্তু ও সংগঠন পুঁজিবাদী চাহিদার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞান সমাজে কর্তৃত্বকারী মতাদর্শটিই আত্মস্থ করে। ফলস্বরূপ এর মধ্যেও জাতিগত, শ্রেণীগত ও স্ত্রী-পুরুষবিভাগগত পক্ষপাত গড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে এই বিজ্ঞানই আবার কর্তৃত্বকারী মতাদর্শকে সাহায্য করে ও সমৃদ্ধ করে তোলে। সুতরাং গণবিজ্ঞানকে নিশ্চিতভাবেই প্রচলিত বিজ্ঞানের সমালোচক হতে হবে—শুধু এর প্রয়োগ বা সংগঠনের ব্যাপারেই নয়, এর উদ্ভব এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রেও। মহিলাদের সংগ্রামের দীর্ঘ পথে, মহিলাদের ভোটাধিকার থেকে শুরু করে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে—নানা বিষয় এই নারী আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। মতাদর্শগত কাঠামো যাই হোক না কেন, নারী আন্দোলন সবসময়ই সেই সব সামাজিক সম্পর্ককেও চ্যালেঞ্জ করেছে, যা তাদের বিচ্ছিন্ন, দ্বিধাবিভক্ত ও নিপীড়িত জীবনযাপনে বাধ্য করে।

বিজ্ঞানের নারীবাদী বিশ্লেষণ

নারীবাদী তত্ত্বের অন্যতম অংশ হলো বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ।

(ক) অনেকে মনে করেন যে, বিজ্ঞান সহজাতভাবেই প্রগতিশীল। সুতরাং প্রচলিত বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ আত্মস্থ করাকে নারীমুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে তাঁরা দেখেন।

(খ) অন্যান্য নারীবাদী সমালোচকেরা কিন্তু বিজ্ঞানের স্ত্রী-পুরুষ পক্ষপাতের ব্যাপারটার নজর দিয়েছেন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই বৈষম্যমূলক আচরণ কি ভাবে কাজ করে—তা দেখাতে চেয়েছেন। অনেকে যুক্তি দেখান যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো নিরপেক্ষ, এর কোন নিজস্ব মূল্যবোধ নেই, এবং প্রাকৃতিক (বা সামাজিক) ঘটনা বিশ্লেষণে একে ব্যবহার করা চলে। আরো বলা হয় যে বিজ্ঞান স্ত্রী-পুরুষ ভেদজনিত পক্ষপাত-দুষ্ট হয় তখনই যখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সঠিকভাবে মানা হয় না অথবা যখন বিজ্ঞান তার লক্ষ্য ও আদর্শের ক্ষেত্রে সমাজে কর্তৃত্বকারী অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সুতরাং সমাধান হলো, সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আত্মস্থ করা ও তা সুসংবদ্ধভাবে ব্যবহার করা। বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী-পুরুষ বৈষম্যের বিরোধিতা করাও এই সমালোচনার একটা দিক। এই সমালোচনার ফলেই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে নারীদের অবস্থান নিয়ে প্রচুর সমীক্ষা শুরু হয়েছে।

এই সব সমীক্ষা দেখিয়েছে যে মহিলারা সাধারণত বিজ্ঞানকে "পুরুষালী" মনে করেন (বিশেষত ভৌতবিজ্ঞানগুলোকে) শুধুমাত্র এই কারণেই নয় যে অধিকাংশ বিজ্ঞানীরাই পুরুষ, বরং পূর্বোক্ত স্ত্রী-পুরুষ বৈষম্যজনিত কারণেও। এই বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে বিজ্ঞানে সাফল্য পেতে গেলে মেয়েদের "নারীসুলভ" ভাবমূর্তি বিসর্জন দিতে হবে। এই সমালোচনা বিজ্ঞানের এক পুনর্গঠন দাবী করে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ বৈষম্যভিত্তিক চিরাচরিত ভূমিকার অবসান এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসে নারীবিজ্ঞানীদের অবদান অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। এই অনুসন্ধানের ফলেই বিজ্ঞানের নারীবাদী ইতিহাস এবং চিকিৎসাবিদ্যায় মেয়েদের অবদানের ব্যাপারে আলোকপাত ঘটেছে। এটি খুলে দিয়েছে আলোচনার এক নতুন ক্ষেত্র—চিকিৎসাবিদ্যার নারীবাদী ইতিহাস; যা সমালোচনামূলকভাবে দেখিয়েছে কিভাবে উনিশ শতকের জীববিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি ঐ শতকের নারীসংক্রান্ত সামাজিক-রাজনৈতিক মতাদর্শকে সুসংবদ্ধ করে তুলেছে।

(গ) আরো সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের নারীবাদী সমালোচনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তথাকথিত "নিরপেক্ষতা" নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এই সমালোচনার উদ্ভব হয়েছে কতগুলো কারণে। যেমন (i) বিজ্ঞানের জগতে "নারী" হিসেবে পুরুষের সাথে সমান অবস্থানে কাজ করার গঠনগত অসম্ভবতা। (ii) "বিজ্ঞানের উষালগ্নে নারীদের অবদান" সম্পর্কিত লেখালেখি যত

বাড়ছে ততই এটা নিশ্চিত হয়ে উঠছে যে অতীতে মহিলারা প্রকৃতিকে জানা ও জ্ঞানান্বেষণের কাজে সরাসরি অংশ নিতেন। তাই প্রশ্ন উঠছে, কিভাবে বিজ্ঞানের জগতে নারীরা এত ব্রাত্য হয়ে উঠলো এবং কেনই বা বিজ্ঞানের অভ্যন্তরীকরণ নারীসুলভ সমস্ত গুণগুলোর অবসান দাবী করে। এটাই সম্ভবত দেখায় যে আসলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যাপারটাই স্ত্রী-পুরুষ বৈষম্যের পক্ষপাতদুষ্ট। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যান্ত্রিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং নিপীড়নমূলক হয়ে সব পুরুষকেন্দ্রিক ভাবাদর্শ গ্রহণ করে ফেলে। যুক্তি সহকারে বলা যায় যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সেই সব গুণের ওপরেই জোর দেয়, যা একটি পুরুষ আধিপত্যবাদী বা পুরুষকর্তৃত্ববাদী ধনতান্ত্রিক সমাজে পুরুষালী গুণ বলে চিহ্নিত।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যে কথাটার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেয় তা হলো "বৈজ্ঞানিক বস্তুনিরপেক্ষতা" (Scientific Objectivity)। এই বৈজ্ঞানিক বস্তুনিরপেক্ষতা ও তথাকথিত "যুক্তিবাদ" যুগ্মভাবে মহিলাদের বিরুদ্ধে তথা নারীমুক্তির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে।

এটা কি বৈজ্ঞানিক ধারণার ভুল ব্যবহারের জন্য ঘটে, নাকি বৈজ্ঞানিক ধারণার সংজ্ঞাটিই এর জন্য দায়ী—তা পরে আলোচিত হবে।

কৌতূহলের বিষয় হলো, গণবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখাতে পারি কিভাবে "বৈজ্ঞানিক বস্তুনিরপেক্ষতা"র ধারণা মহিলাদের বিরুদ্ধে কাজ করে। এই ধারণা একটি "সক্রিয় কর্তা" (subject) এবং একটি নিষ্ক্রিয় "বস্তু" (object)-র অস্তিত্ব নির্দেশ করে আর তাদের মধ্যে পরিষ্কার সীমারেখা টানে। এইভাবে বস্তুকে তথা প্রকৃতিকে নিষ্ক্রিয় সত্বা হিসেবে দেখানোর ফলে একটা একপেশে যান্ত্রিক ও স্থবির ছবির সৃষ্টি হয়। এই ধারণার ফলেই মহিলা সংক্রান্ত আলোচনায় তাদেরকে 'বস্তু' হিসেবে দেখা হয়। মহিলাদের শারীরবৃত্তের গবেষণায় এই ঘটনা কিভাবে ঘটেছে তা নারী স্বাস্থ্য আন্দোলন সংক্রান্ত আলোচনায় একটু বড় করে বলা হবে। (মাতৃদুগ্ধের সপক্ষে 'ইউনিসেফ' ও 'হু' প্রচারিত ক্যালেণ্ডারে দেখবেন—যদিও প্রকৃত সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই একটি প্রয়োজনীয় ধারণার প্রচার করা হয়েছে তবু সেখানে প্রচারের খাতিরে নারীদেহকে বস্তু হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে)। বৈজ্ঞানিক বস্তুনিরপেক্ষতা আবেগপূর্ণ যে কোনো অভিব্যক্তি বা মতামতকে নাকচ করে দিতে পারে—বস্তুত তাই দিচ্ছে। কেউ যদি আদর্শগত দায়বদ্ধতা থেকে বা অন্য কোন গভীরতার জন্য আবেগপূর্ণভাবে কিছু প্রকাশ করে, তবে বৈজ্ঞানিক বস্তুনিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে হাবা-গোবা বলেই রায় দেওয়া হবে। যুক্তি ও আবেগ যেন পরস্পর-বিরোধী—এরকম দেখানো হয়ে থাকে। তাই সামাজিক সমস্যার বিশ্লেষণে এই বৈজ্ঞানিক বস্তুনিরপেক্ষতার ব্যবহার গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বলাই বাহুল্য যে, জনগণের সংগ্রামে এমনকি মহিলাদের সংগ্রামের জন্যও সমাজ-বিশ্লেষণ একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। এই সমস্ত বিশ্লেষণকে অনেক সময়ই "অ-বৈজ্ঞানিক" বলা হয়, কারণ বৈজ্ঞানিক বস্তুনিরপেক্ষতার মাপ-কাঠিতে সেগুলো উত্তীর্ণ হয় না। বস্তুনিরপেক্ষ হওয়া মানেই প্রগাঢ়, দক্ষ ও নিরপেক্ষ হওয়া—এরকম একটা ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তির নিজস্বতাকে অগ্রাহ্য করে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির তফাতকে পাত্তা দেয় না এবং সমস্ত অন্বেষণকে কতকগুলো ধরাবাঁধা ছকে ও পরিসংখ্যানে পরিণত করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, বৈজ্ঞানিক বস্তু-নিরপেক্ষতার এই ধারণা সমষ্টিগত বা পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্কের ব্যাপারে কোনো কথাই বলে না। এটা কেবল দুটো ব্যাপারকেই তুলে ধরে—জয় অথবা পরাজয়।

নারী স্বাস্থ্য আন্দোলন

(ঘ) গণবিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজকর্ম প্রায়শই বিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করে না। যদি বা কখনও তারা সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর দিকে তাকায়, তবু কিছুদিন আগে অবধিও তারা কখনই বিজ্ঞান সম্পর্কিত নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে বা নারীবাদী সমালোচনাকে হিসাবের মধ্যে ধরত না। নারী স্বাস্থ্য আন্দোলন হল এক গণবিজ্ঞান কার্যক্রম। কিন্তু তা কখনই গণবিজ্ঞান আন্দোলনের মূল ধারার অংশ ছিল না। নারী স্বাস্থ্য আন্দোলন "বৈজ্ঞানিক বস্তুনিরপেক্ষতা"র কল্পকাহিনীকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, যখন তা গত কয়েকশ বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার তুলনায় নারীদেহ এবং তার শরীরভিত্তিক কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক তথ্য তুলে ধরেছে। আমি মনে করি এক নতুন কর্মপদ্ধতির এ হল প্রথম মূর্ত দৃষ্টান্ত, যা এক মানবিক বিজ্ঞানের লক্ষ্যে যাত্রা করেছে। নারী স্বাস্থ্য আন্দোলন অনেক প্রশ্ন তুলে ধরেছে। ধরা যাক জন্মনিরোধকের কথা। এর দ্বারা এই আন্দোলন শুধু যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ফলকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে তাই নয়, এটা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে ওই গবেষণার পদ্ধতিটাকেও। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল—রজঃস্রাব, গর্ভাবস্থা ইত্যাদি সংক্রান্ত নারীবাদী গবেষণা এমন এক পদ্ধতি ব্যবহার করেছে যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পূর্ণ দাম দেয়। এই পদ্ধতি মহিলাদের জড়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করে না, বরঞ্চ সক্রিয় অংশগ্রহণকারী মনে করে, আর, একটি জৈব ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত উপাদানকেই এই পদ্ধতি গুরুত্ব দেয়।

(ঙ) গণবিজ্ঞান আন্দোলন ভারতে নারীদের প্রশ্নকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছে। এই আন্দোলন নারীবাদী দৃষ্টিকোণকে হিসাবের মধ্যে নেয়নি এবং বিজ্ঞানের নারীবাদী সমালোচনাকে একদমই বিবেচনা করেনি। আংশিকভাবে এর জন্য দায়ী বিজ্ঞানের ব্যাপারে অ-সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী। অর্থাৎ, যদিও এটা বিজ্ঞানের 'অপব্যবহারের' ব্যাপারে যথেষ্ট সমালোচনা করে, তবু বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতিকে নিরপেক্ষ বলে মেনে নেয়। এটা কি ধরে নেওয়া যায় যে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের এই মনোভাবই উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে "যথোপযুক্ত প্রযুক্তি"-র (Appropriate Technology) প্রসঙ্গে মহিলাদের অবস্থা আরও শোচনীয় করে তুলেছে ?

(চ) কিছু গণবিজ্ঞান গোষ্ঠীর নেওয়া কয়েককটি "মহিলা সংক্রান্ত বিষয়"-এর দিকে নজর দেওয়া যাক। বোম্বাই গণবিজ্ঞান গোষ্ঠীর মহিলা ও স্বাস্থ্য গোষ্ঠীর প্রদর্শনীর কথাই ভাবা যাক। এতে মহিলাদের

জনন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটা শুরু হয়েছিল যৌন বিবর্তনের ঐতিহাসিক চিত্র সহ, এবং বিভিন্ন জননতন্ত্রের তফাৎ ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। বয়ঃসন্ধিতে কি হয়, তারপর গর্ভসঞ্চার, ভ্রূণ ছেলে কি মেয়ে কি ভাবে নির্ণয় করা যায়, ইত্যাদি আলোচিত হয়েছিল। নজর কাড়া ও সাড়া পাওয়ার দিক থেকে বিচার করলে এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছিল। এ ছাড়া কিছু গণবিজ্ঞান গোষ্ঠী যে দুটি বিষয় বেছে নিয়েছিল তা হল অ্যামনিওসেন্টেসিস পদ্ধতি দ্বারা ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় এবং গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের জন্য চড়া মাত্রায় এস্ট্রোজেন-প্রোজেস্টেরোন মিশ্র ওষুধের ব্যবহার বন্ধ করার প্রচারাভিযান।

স্বাভাবিক ভাবেই, এর কোনটাই গণবিজ্ঞান গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের মূল ধারা থেকে আসেনি (এবং গণবিজ্ঞান গোষ্ঠীগুলির সংজ্ঞা হল —তারাই যারা নিজেদের ওই নামে ডাকে)। প্রথম কার্যক্রমটি বেশী সংবদ্ধ এবং অন্যান্য গণবিজ্ঞান কার্যক্রমের সঙ্গে এটিকে একসাথে দেখান হয় (সময় বিশেষে প্রথমাংশ ছাড়া), তবে এর মূলে আছে এক ছোট মহিলাদের গোষ্ঠী যার সদস্যরা গণবিজ্ঞান কর্মী ছিলেন বা এখনো আছেন। আমি অবশ্য এই ব্যাপারটায় জোর দিতে চাই না, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কাজকর্ম চলছে ততক্ষণ এতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, স্ত্রী-পুরুষ সমানাধিকারবাদ বা মহিলাদের বিষয়গুলি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা গণবিজ্ঞান আন্দোলনের দর্শন বা মতাদর্শর অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। অ্যামনিওসেন্টেসিসের বিষয়টি তোলা হয় মহিলা গোষ্ঠীতে, এবং ই·পি. ফোর্ট সংক্রান্ত প্রচারাভিযান করতে আবেদন জানানো হয় ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া কর্তৃক আয়োজিত একটি ড্রাগ-ওয়ার্কশপে, পুণায়। অস্বীকার করা যায় না যে এই দুটি বিষয় গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে জড়িত, তবুও এ ব্যাপারে তেমন কিছু সাড়া পাওয়া যায়নি। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পতাকার বাইরে "চিপকো" আন্দোলনের কথা বলা যায়, যা শুরু হয়েছিল পরিবেশ আন্দোলন হিসাবে। আন্দোলনকারীদের প্রধান অংশই ছিল মেয়েরা। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের জীবনধারা এবং সামাজিক কাজকর্মও আঘাতের মুখে পড়েছিল। "চিপকো" অবশ্য গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কাজকর্মের পরিধির মধ্যে রয়েছে বলা চলে, কারণ এটা বিজ্ঞানের অপব্যবহার সংক্রান্ত।

দু'বছর আগে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে, আমরা কয়েকজন দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম যে বিজ্ঞান মেয়েদের থেকে দূরের (alien) কিছু নয়। আমাদের সঙ্গে ছিল প্রকৃতি সম্বন্ধীয় প্রাথমিক জ্ঞানভাণ্ডারে মেয়েদের অবদান দেখিয়ে তৈরী করা কিছু পোস্টার। আমরা আসলে হাতে-কলমে দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম যে প্রথাগত রান্নায় প্রায়ই ভৌত এবং রাসায়নিক পদ্ধতির ধ্যানধারণা কাজে লাগে, যা এখন শিল্পেও ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা ব্যবহার করেছিলাম, চাপের সঙ্গে স্ফুটনাঙ্ক পরিবর্তন, অম্ল-ক্ষার (তেঁতুল, চুণ), অভিস্রবণ, ছোলার ফুলে ওঠা ইত্যাদির ধারণা। এর সাথে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পেঁয়াজ ও আলুর কোষ দেখানর ব্যবস্থাও করেছিলাম। আরও ছিল একটি ছত্রাক "বাগান" এবং কি করে তাদের বৃদ্ধি আটকান যায় তার আলোচনা। বিভিন্ন কারণে, এই অনুষ্ঠান খুব বেশী সমাদর পায় নি, যার প্রধান কারণ— এটা যথেষ্ট ভাল করে বানান হয় নি। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে গণবিজ্ঞান গোষ্ঠীগুলি, ঐতিহাসিক সম্পর্ক অনুসন্ধান বা অন্য নানারকম কার্যকলাপ (যা মহিলাদের অস্তিত্বের সাথে জড়িত) দ্বারা মেয়েদের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আনার জন্য খুব বেশী প্রচেষ্টা চালায় নি।

গণবিজ্ঞান গোষ্ঠীগুলি বিজ্ঞানীদের কর্মক্ষেত্রেও এই সব বিষয়কে সতর্কভাবে এড়িয়ে চলেছে। নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে, যদি গণবিজ্ঞান আন্দোলন বিজ্ঞানের প্রতি সমালোচনামূলক হতে চায় তবে তাকে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের নারী বৈজ্ঞানিকদের সাথে একাত্ম হতে হবে এবং তাদের সমস্যার ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে। বস্তুত যদি গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সংজ্ঞায়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর একচেটিয়া অধিকার এবং ক্ষমতা অনুযায়ী স্তরযুক্ত শ্রেণীবিভাগের (যা এই জ্ঞানের ছিটেফোঁটা একজনের ক্ষমতাকেন্দ্রিক অবস্থান অনুযায়ী দান করে) 'প্রতি এক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্ভুক্ত হয়, তবেই এই একচেটিয়া অধিকার ভাঙার জন্য নারীদের যে সংগ্রাম (উদাহরণস্বরূপ, নার্সদের মধ্যে নানান ঘটনায়) তা মহিলা গোষ্ঠীগুলির থেকে সাহায্য পেতে পারে। কিন্তু এখনও অবধি গণবিজ্ঞান গোষ্ঠীগুলি প্রচলিত বিভিন্ন ধারণাকে সত্যি সত্যি চ্যালেঞ্জ না করেই এক ধরনের 'বিকল্প"-এর কার্যকারিতা প্রদর্শন করতে ব্যস্ত। এবং এটা মেয়েদের বিষয়গুলির ক্ষেত্রে খুবই সত্যি, যদিও খুব বেশী দেরী নেই যখন নারী আন্দোলন এই পরিস্থিতিকে বদলে দেবে। দুঃখের কথা, প্রথাগত বা প্রাতষ্ঠানিক বিজ্ঞানের মতই গণবিজ্ঞান আন্দোলনেও মেয়েরা সংখ্যালঘু। এর কারণগুলি লুকিয়ে আছে প্রথাগত ব্যাখ্যার চেয়েও গভীরে—খুবই সম্ভব যে মেয়েদের সাধারণভাবে বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধাগুলি গণবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কাজ করে। বিজ্ঞান ও তার কর্মপদ্ধতিকে কোন সমালোচনা ছাড়াই গ্রহণ করার মধ্যে গণবিজ্ঞান আন্দোলন "পুরুষালী" পোশাকের দখল নিয়েছে।

গণবিজ্ঞান আন্দোলনের করণীয় কাজ

(ছ) এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে আমরা কি গণবিজ্ঞান আন্দোলনের করণীয় কি হতে পারে তাতে পৌছতে পারি?

(1) বিজ্ঞানকে দুর্বোধ্যতা ও রহস্যপূর্ণতা থেকে মুক্ত করা এবং বৈজ্ঞানিক তথা সমস্ত ধরনের জ্ঞানের উপর থেকে একচেটিয়া অধিকারকে ভাঙা।

(2) পুঁজিবাদী তথা পুরুষকর্তৃত্ববাদী সমাজের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ককে দেখিয়ে বিজ্ঞানের মতাদর্শগত প্রকৃতিকে উন্মোচিত করা।

(3) বিজ্ঞান তথা বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রচলিত প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ জানান, এবং প্রশ্ন তোলা এর উদ্দেশ্য, এর কর্মপদ্ধতি এবং 'জনগণের জন্য বিজ্ঞান' এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে।

(4) বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলিতে পুরুষ ও নারীদের সংগ্রামের সাথে

কার্যকরভাবে যুক্ত হওয়া, কারণ প্রশ্নাতীতভাবে এই সংগ্রামগুলি চ্যালেঞ্জ জানায় ক্ষমতাকেন্দ্রিক স্তরযুক্ত সেই শ্রেণীবিভাগকে যার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান ব্যবহৃত হয় এবং যা নিয়ে যায় অসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন এক বিজ্ঞানের দিকে।

(5) কর্মস্থলের সমস্যাগুলির সাথে কার্যকরভাবে যুক্ত হওয়া। জনগণের উপর নিপীড়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যেকার সম্পর্ক প্রচুর আলোচিত হয়েছে এবং এর বিস্তারিত আলোচনার আর প্রয়োজন নেই। আর যদি প্রয়োজন থাকেও তবু তা এই ছোট লেখাটির সীমার বাইরেই থাকুক।

(6) এমন একটি বাতাবরণের জন্য চেষ্টা করা যাতে অ-প্রতিযোগিতা-মূলক, যান্ত্রিকতামুক্ত, পুঙ্খানুপুঙ্খ-পরীক্ষা বিরোধী এক বিজ্ঞান বিকশিত হতে পারে। নারী গোষ্ঠীগুলি চিন্তার নতুন পথ তৈরী করছে। অন্য কথায়, তারা তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে প্রকৃতি এবং সমাজকে অনুসন্ধানের ও ধ্যানধারণার এক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে, যা বিজ্ঞানের সামনে পড়ে বাতিল, মূল্যহীন হয়ে গিয়েছিল। গণবিজ্ঞান গোষ্ঠীগুলিকে যথেষ্ট খোলামেলা হতে হবে যাতে তারা এই ধারাগুলির ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে পারে।

মহিলাদের স্বার্থ জড়িত কিছু কার্যক্রম

1) কিছু কিছু জায়গায় সাম্প্রতিককালে দৃষ্টি আকর্ষণকারী একটি তত্ত্ব যা হোমোস্টাসিস্ (Homostasis) সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা ও আরো বহু তত্ত্বকে ব্যবহার করে, প্রস্তাব করছে যে মহিলাদের পুষ্টি সংক্রান্ত প্রয়োজন, আগে যা ভাবা হতো তার থেকে অনেক কম। যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, আশ্চর্যজনকভাবে তা সামান্যই আপত্তির মুখোমুখি হয়েছে। এর অর্থ কি এই যে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তটি সঠিক ?

2) গণবিজ্ঞান আন্দোলন কখনই সমাজে পুরুষ-নারী সম্পর্কের যে কর্তৃত্বকারী-বশ্যতামূলক চেহারা দেখা যায় সে ব্যাপারে আপত্তি জানায় নি। এটা মনে রাখা দরকার যে পুরুষ-নারী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা, অংশত, মহিলারা শারীরিকভাবে দুর্বলতর—এই কল্পকথার ওপর নির্ভরশীল। আজকের দিনে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, বিশেষত খেলাধুলোর সাথে জড়িত মহিলাদের ক্ষেত্রে, যা ব্যবহার করে এই ধারণার বিরোধিতা করা যায়; যা হয়তো খোলাখুলি বলা হয় না, কারণ তা বহুদিন ধরে, মনের গভীরে গেঁথে আছে। আসলে, এইরকম তথাকথিত "বৈজ্ঞানিক" গালগল্প ছড়িয়ে মেয়েদের কিছু বিশেষ ধরনের চাকুরীর মধ্যে তথা কিছু বাঁধাধরা সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে বেঁধে রাখা হয়।

3) মহিলাদের জীবনের ওপর যথোপযুক্ত প্রযুক্তির প্রভাব পরীক্ষা করার কাজ খুব জরুরী। কোন সমস্যার সংজ্ঞা খোঁজার ব্যাপারেও মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। যে সব রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজ সবচেয়ে বেশী হয়েছে, সেখানেই মহিলাদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে কম। যথোপযুক্ত প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও কি এই অবস্থাই চলছে ?

এই লেখাটিতে স্পষ্টভাবে কিছু জানা তত্ত্ব, তথ্য ও কিছু ধারণাকে সন্নিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে এইগুলো সংঘবদ্ধ হতেও পারে, নাও পারে। এটা কোন বাইরের লোকের সমালোচনাও নয়, এখানে আলোচিত অনেক কিছুই বম্বের মহিলা সমাজ কর্মীদের আলোচনার বিষয় ছিলো।

মূল রচনা : পদ্মা প্রকাশ
[ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলী,
22 সেপ্টেম্বর 1984]
অনুবাদ : শিবপ্রসাদ নিয়োগী
সুরঞ্জন কর

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

CHITTARANJAN MONDAL

MECHEDA
MIDNAPUR

জ্ঞানের গুঁতো
একটি কড়চা

আমাদের দেশের মাতব্বর অর্থনীতিবিদ এবং আমাদের দেশের সরকারের মতোই আমরাও অর্থাৎ আমি ও আমার ছাত্রবন্ধুরা বুঝে গেছি যে শিক্ষা ব্যাপারটা আন্-প্রোডাকটিভ। বুঝতে বেশ সময় লেগেছে—এটাই যা লজ্জার। তবে আমার একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ভাই এখুনি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে এবং চারপাশের বাতাবরণ যা তাতে মনে হয় এই অধোগামী ব্রহ্মজ্ঞান অল্পকাল পরেই পঞ্চম—বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পৌঁছে যাবে। আর শোনাও তো যায়, আজকালকার বাচ্চারা নাকি খুব চালাক-চতুর হচ্ছে। এটা ভাববেন না যে আমি, আমার ভাই ও আমার বন্ধুরা স্কুল পালানো, কান ধরে দাঁড়ানো, "তেরে মেরে পেয়ার" দেখা ফালতু ছেলে। লেখাপড়া শুরু করার পর থেকে ন' মাসে ছ' মাসে আমাদের মগজ-ঘিলু পরীক্ষা করে—বেশ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন পরীক্ষকেরা। যাক্, এখনো তাদেরই পড়াশুনোর জন্য পরিশ্রমটা পণ্ডশ্রম হয়নি যারা ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেক্ গন্ধযুক্ত বিষয়গুলো নাড়াচাড়া করে। এছাড়া সাহিত্য, অর্থনীতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস এবং উদ্ভিদবিদ্যার মতো নপুংশক বিষয়গুলো যাদের চর্বণের সামগ্রী, তাদের সকলকেই আমি আগেভাগে আলিপুর জু'র পশুপাখী মৃত্যুর ব্যাপারে খোঁজ রাখতে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

তবে আমার সহপাঠীরা অনেকেই আমাকে এক্সট্রিমিস্ট বলে মনে করে। যদিও দীর্ঘশ্বাসটা তাদেরও সঙ্গী কিন্তু এখনো তারা প্রাণায়াম অভ্যাস করে দীর্ঘশ্বাসকে ছোট করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। একটু দূরের দিকে তাকাতে তাদেরও বুক কাঁপে, তাই প্রাণপণ প্রয়াসে পুঁথির পাতায় চোখ সেঁটে 'মাইনাস পাওয়ার' বাড়াচ্ছেন। দু'একটা সুসংবাদ তাদের চাঙ্গা করে—যেমন অমুক দাদার অধ্যাপনার চাকুরী পাওয়ার সংবাদ। তারা ভুলে যান যে অমুক দাদাটি প্রায় হাজার জন তলিয়ে যাওয়া দাদা দিদির (এম. এস. সি!) একজন, এবং বিগত চার পাঁচ বছরের মধ্যে এই পরম আহ্লাদের খবরটা মাত্র একবারই শোনা গেল। অধ্যাপনা চাকুরীর আপেলটা আমিও দেখেছি কিন্তু আমি আরো দেখেছি যে ওটা খুড়োর কলের ডগায় ঝুলছে, অগত্যা দার্শনিক বনে গেছি।

আমার পড়ুয়া বন্ধুরা (মোটেই ভাববেন না তারা বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত) জোর ছুটছে। প্রায় ষাটজন যুবক-যুবতী একসাথে পড়ি, সমবয়সী। কিন্তু আমরা কেউ কারো বন্ধু নই, প্রতিযোগী। আমার খুব মজা লাগে যখন দেওয়ালে লেখা দেখি "ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ"। রেসকোর্সের ঘোড়াদের মাঝখানে "ঘোড়া ঐক্য জিন্দাবাদ" শ্লোগান তোলার মতোই বেদম হাসির ব্যাপারটা। হাসির আরো ব্যাপার আছে—প্রায় পুরোটাই। আমাদের তিন-চার মাস পরপর পরীক্ষা হয় বলে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত থাকতে হয়। ক্লাস নোট টোকা, লাইব্রেরীর বই থেকে টোকা, স্যারদের ঘরে প্রয়োজনীয় যাতায়াত, অন্য বন্ধুদের দিকে গোয়েন্দার মতো নজর রাখতেই হু হু করে আমাদের সময় কেটে যায়। শুনেছি আমার এক ইংরেজী সাহিত্যের দাদা নাকি এক স্যারের বাজার করে দিতো; রোজ নয়, মাঝে মাঝে। এটা বিশ্বাসযোগ্য না হলে আমার দেখা ঘটনাই বলি। একবার আমাদের আসন্ন পরীক্ষার "ইন্টারনাল" পরীক্ষকের জ্বর হবার সংবাদ আমার সহপাঠীদের কি আনন্দই না দিয়েছিলো! তাকে দেখতে যাওয়ার জন্য এক প্রবল উদ্দীপনা—সত্যি, ভাবলেই গায়ে আমার পুলক লাগে।

শিক্ষকমশাইদের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তির ব্যাপারটা বলতেই হয়। আমাদের 'কেন পড়বো?' প্রশ্নটা ওঁদের কাছে আগে থেকেই 'কেন পড়াবো?' হয়ে গেছে। অনেকেই তাঁদের ছাত্রজীবনের স্মৃতি, অধুনা হলুদ হয়ে যাওয়া নোট্ ডিক্টেট্ করেন—আমরাও চল্লিশ বছর পর সেই চিরন্তন সত্যি কথাগুলো লিখে রাখি। তবে অধিকাংশ ক্লাসেই চোখ, কান ও মস্তিষ্কের ওপর বড়ই চাপ পড়ে। বাধ্য হয়েই এক প্রবল আক্রমণকারী স্যারের ক্লাসে যাওয়া ছাড়তে হলো। তলব পড়ায় যেতেও হলো তাঁর ঘরে এবং একটু ঘুরিয়ে বলতেও হলো তাঁর মহামূল্যবান ক্লাস থেকে আমার অনিচ্ছাকৃত অপসারণের কারণ। মুহূর্তেই সেই শিক্ষক মশাই শোলের গব্বর সিং হয়ে গেলেন—আমার চোখের সামনেই! বল্লেন তাঁর হাতেই নাকি আমার জীয়ন-মরণ কাঠি। সেটা বিলক্ষণ জানি বলেই অনেক স্তবস্তুতি করে নিষ্কৃতি পেলাম (গল্প নয়, সত্যি)। আমাদের স্যারেরা হাসলে আমরা হাসি, নইলে চুপটি করে থাকি। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পরিণত যুবক-যুবতীদের তাঁরা যা খুশী বলতে পারেন, অকারণে অপমান করতে পারেন। তার প্রতিবাদ! মাথা খারাপ—আপনি বাঁচলে বাপের নাম!

রাজনৈতিক সংখ্যালঘু ছাত্ররা "শিক্ষানীতি", "শিক্ষাক্ষেত্রে হিটলারের ছায়া" ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে উত্তাল হচ্ছেন, কিন্তু আমাদের এই নিত্যদিনের খর্ব হয়ে যাওয়া—লাঞ্ছিত হওয়ার দিকে তো তাঁদের নজর ফেরে না। তাই এই গড্ডালিকা প্রবাহের ঘূর্ণিস্রোতে আমরাও আছি বেশ···আসুন, এবার বায়োটেকনোলজির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রতিক্রিয়াশীল ঈশ্বর চেয়েছিলেন ইভ ও আদমকে জ্ঞানফলের থেকে বঞ্চিত রাখতে। কিন্তু সরকার তেমন নন। ক্লাস ফোর পর্যন্ত অনেকেই পড়ুক তাঁরা এটা মনেপ্রাণে চান। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত অংক-ভূগোল-ইতিহাসের সঙ্গে দুধ-রুটিও আছে। এই ঢালাও শিক্ষার অঙ্গনে দলে দলে ছাত্ররা আসছে—দুধ-রুটি খাচ্ছে এবং তাদের অধিকাংশই যথাস্থানে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু এই হলো শিক্ষা পিরামিডের প্রশস্ত

পাদদেশ। এর পর থেকে ক্রমেই সংকীর্ণ বন্ধুর পথে চূড়ার দিকে যাত্রা—সে পথে কত পদস্খলন, রক্তক্ষয়, অশ্রু! প্রথম বড়সর ধাক্কাটি হলো মাধ্যমিক পরীক্ষা। গত কয়েক বছরের হিসেব অনুযায়ী প্রায় তিন লক্ষ অগ্রগামী বঙ্গসাবক এই পরীক্ষায় বসছে। তাদের অর্ধেকই এখানে ঘায়েল হয়। তারপর উচ্চ মাধ্যমিক। এ বছর তাতে একশ জনে ষাটজনই ফেল। পাশ করা অল্প কিছু ছাত্রছাত্রীর জন্য অল্প কিছু কলেজের আশ্রয়। আর অনার্স—সে এক দেবলভ্য ব্যাপার। অনার্সপ্রাপ্ত গুটিকয় স্নাতক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র পায়। এবং তাদের মধ্যে থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা, অধ্যাপনার চাকুরী পাওয়া বা ইউ. জি. সির বদান্যতা পাওয়া বা নিদেনপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকতার চাকুরী বিজয়কারী হে প্রবলপরাক্রমশালী নিঃসঙ্গ বীর—তোমায় জানুভঙ্গ ছাত্র-যুবের পক্ষ থেকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন!

* * *

প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর সামাজিক মর্যাদার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপার বহুল প্রচলিত মাপকাঠি যেমন তার / তার স্বামীর পকেটের স্থূলত্ব—তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের (সব মাপেরই—3 ফুট থেকে 6 ফুট) সামাজিক সোহাগের মাপ-কাঠি হলো তাদের চর্বন ও বমণ কুশলতা। অর্থাৎ "শিক্ষাব্যবস্থা" এক অতি ক্ষমতাসম্পন্ন সামাজিক কাজী। তার তর্জনী যা নির্দেশ করে তাই ধ্রুব সত্য হয়ে দাঁড়ায়। সে যাকে "অপদার্থ" বলে—সে হাটে-মাঠে-বাটে শুধু "অপদার্থ"ই হয়ে যায়, সে তার আর যত ভালো গুণই থাক। বাবা-মা বৈঠকখানায় যতই তার পক্ষ নিয়ে বলুন না কেন "ও তো ভালোই পরীক্ষা দিয়েছিলো, আজকাল যে কি খাতা দেখা হয়!" বা "পরীক্ষার আগে অসুখ করলো, আমরা তো পরীক্ষা দিতেই না করেছিলুম, তবুও ...", বৈঠকখানা থেকে বেরুলেই তাঁদের মুখোস খুলে যায়। তখন সেই ছাত্রটি বাবা-মার ফেলু সোনা, ভাই বোনদের ফেলুদা, পাড়ার কিশোরী বা আসন্ন যুবতীদের হাসির খোরাক—'ফেলুরাম"। ফেলু তখন 'ছ্যা, ছ্যা' আর "আহা চুক্ চুকে"র নিষ্ঠুর তাড়নায় খর্ব থেকে খর্বতর হয়ে যায়। উন্মত্ত নির্দয় পারিপার্শ্বিক কেবল তার ক্ষততে নুনের ছিটে দেয়—তার নরম কিশলয়ের মত সত্তাটিকে নিষ্পেষিত করে দেয়। সমাজের সর্বত্রই অবমাননা পাওয়া ছেলেটি গাঢ় অভিমান বুকে নিয়ে হয় আত্মঘাতী হয়, বাড়ী থেকে পালায়, নয় উচ্ছৃঙ্খল, অত্যাচারী 'মস্তান' হয়ে যায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে নেশার কাজল চোখে পরে নেয়। মদ চরস গাঁজা বা হেরোইন, ব্রাউন সুগারের রথে চেপে পৌছে যায় এক স্বর্গের দেশে। সেখানে অপমান নেই, ছ্যা ছ্যা নেই, শুধু এক অতল ঘুমের রাজ্য।

হ্যাঁ, শিক্ষাক্ষেত্রই হলো সেই কারখানা যা প্রভুদের জন্য প্রয়োজনীয় গুটিকয় বিজ্ঞানী-ডাক্তার-মোক্তার তৈরী করে আর তৈরী করে অসংখ্য ধ্বসে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া ভগ্ন মানুষ।

শিবপ্রসাদ নিয়োগী

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

M/s Saha & Mondal

MECHEDA

MIDNAPUR

॥ মৌল গবেষণা — প্রয়োজন না প্রসাধন ? ॥

সুব্রত ভট্টাচার্য্য

অতীতেও হয়েছে, এখনও হয়। মৌল (Basic) বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা-নিযুক্ত বিজ্ঞানকর্মীদের মাঝে মাঝেই একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হ'তে হয়—"এই যে তোমরা সব অঙ্কটঙ্ক করো, করো অনেক বিচিত্র ভাবনাচিন্তা, সময়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও, তা সমাজের কী কাজে লাগবে ?" সে মৌল গবেষণার প্রকৃতি পুরোপুরি তত্ত্বীয় ধর্মের হোক, বা হোক পরীক্ষামূলক। আর, মৌল গবেষণা বলতে আমরা এখানে বোঝাতে চাইছি সেই সব বিশেষ গবেষণা (তা কখনও তত্ত্বীয়, কখনও পরীক্ষামূলক) যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কতগুলো মূল প্রশ্নের মীমাংসায় বা প্রকৃতির কোনো রহস্যময় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত। যাই হোক, যে প্রশ্নটির কথা বলছিলাম তা খুবই নিরীহ, সাদামাটা ও অতি সাধারণ কৌতূহলী প্রশ্ন ; কিন্তু যথেষ্ট অস্বস্তিকর ! এ কারণে অস্বস্তিকর যে 'কী কাজে লাগবে' বা 'কোথায় কাজে লাগবে'-র উত্তরটা সব সময় চোখে আঙ্গুল দিয়ে প্রশ্নকর্তাকে দেখিয়ে দেওয়া যায় না। তার আবার দুটি বা দুয়ে-মিলে-একটি কারণ। প্রথমত, প্রশ্নকর্তার বিজ্ঞানজগৎ সম্পর্কে সম্ভাব্য অপরিচিতি ; আর দ্বিতীয়টি হ'ল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিজ্ঞানকর্মীর তাৎক্ষণিক নিজস্ব অস্পষ্ট ধারণা। কারণ যাই-হোক, এতে জটিলতা বাড়ে। অনেক সময়ই উত্তরদাতাকে উদাহরণের আশ্রয় নিতে হয় এবং তখনকার মত হলেও পরোক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায় খুঁজতে হয়। হয় তো বলতে হয় : নিউটনের গতিসূত্র, কেপলারের সূত্র, মহাকর্ষ তত্ত্বের নিয়মাবলী বাদ দিয়ে কি মানুষের পক্ষে কোনোদিন মহাকাশ-অভিযান সম্ভব হ'ত ? ফ্যারাডের তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের নিয়ম, ম্যাক্সওয়েলের সূত্র এবং বেতার-তরঙ্গের নিয়মাবলি না জানা থাকলে কি সম্ভব হত আজকের বিশ্বজোড়া রেডিও-টেলিভিসন ব্যবস্থার বিন্যাস ? আণবিক-সূত্র, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও আপেক্ষিকতাবাদের মিলিত তত্ত্ব ছাড়া কি সম্ভব হ'ত পারমাণবিক শক্তি ও পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের অতি আতঙ্কজনক (অপ-) সাফল্য ? অথচ এর প্রত্যেকটি এখন বিশ্বজোড়া প্রযুক্তি ও বাণিজ্যের সহায়-সম্বল ; প্রতিটি দেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব কত ব্যাপক ও গভীর তা সাক্ষর প্রায় সবারই জানা কথা।

বৈজ্ঞানিক মৌলতত্ত্বকে প্রয়োগের দিকে নিয়ে যায় প্রযুক্তি, যা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনেক বিষয়ে গবেষণার অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত। আর, যুক্তি ও চিন্তা যত দ্রুত দৌড়য় তত দ্রুতগামী নয় প্রযুক্তি। ফলে, মৌলতত্ত্ব ও তার বাস্তব প্রয়োগ থেকে লভ্য ফলপ্রাপ্তিতে, অনেক সময়ই, বেশ কিছুটা সময়ের ব্যবধান ঘটে যায়। 'লেসার' গবেষণার কথাই ধরা যাক—যা আজ বিজ্ঞাননীতি প্রণেতাদের চোখের মণি ! কিন্তু এর মূল তত্ত্ব "স্টিমুলেটেড এমিশ্যান অব র‍্যাডিয়েশন" আবিষ্কৃত হয়েছিল অনেক আগে, 1917 সালে, এবং আবিষ্কর্তা ছিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন। কিন্তু সেটি ছিল তখন নেহাৎই একটা পর্যবেক্ষণগত মৌল আবিষ্কার—যার যৌক্তিকতা স্বীকৃত। ব্যাস্। আর আজ ? সে এক বিশাল টেকনোলজিক্যাল জগৎ, এক সম্ভ্রান্ত গবেষণাক্ষেত্র। রোগনির্ণয়সহ রোগ-নিরাময় থেকে শুরু ক'রে যুদ্ধাস্ত্র-গবেগণা পর্যন্ত তার বিপুল প্রয়োগের বিশাল পরিধি, যার প্রভাব অতি সুদূর-প্রসারী। ফলে, সব গবেষণাই এক্ষুণি হাতে নাতে ফল এনে দেবে ভাবা মস্ত ভুল—কোনো কালেই তা হয়নি। অনেক আবর্জনা বাদ দিয়ে শাঁসটুকু ঘরে তুলতে ঘটতেই পারে বেশ-কিছুটা সময়-দূরত্ব। তাতে সাধারণ মানুষ অসহিষ্ণু হ'য়ে পড়লে ক্ষতি নেই খুব, কেননা তার কারণটা হ'ল—হয় সম্যক অজ্ঞতা নয় অসচেতনতা। কিন্তু তাবড়-তাবড় চিন্তাশীল প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞরাও যদি এতে তেতে ওঠেন তাহলেই বিপদ—যা এখন ঘটছে দেশে দেশে। এবং ভারতবর্ষেও।

একটি কথা মনে রাখা এ প্রসঙ্গে খুবই জরুরী যে প্রযুক্তি গবেষণা তো নয়ই, মৌল গবেষণাও আজ আর পুরোপুরি ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা ও ইচ্ছা দ্বারা সম্ভব নয়। প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষণা ছাড়া ফলিত ও মৌল দু'ধরনের গবেষণাই আজ প্রায় অসম্ভব। আর, প্রতিষ্ঠান বলতেই পয়লা নম্বর হ'লেন দেশজ সরকার। তাছাড়া আছেন ব্যক্তি-মালিকানাধীন কিছু শিল্প-সংস্থা ও কিছু আন্তর্জাতিক বহুজাতিক শিল্প-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলোতে মূলত এ তিন শিবিরের ছত্রছায়াতেই 'গবেষণা' নামক ব্যাপারটি পরিচালিত হ'য়ে থাকে। এবং, এ তিনপক্ষই দেখা যাচ্ছে মৌল গবেষণার ওপর বেজায় খাপ্পা। ফলে মৌল গবেষণায় আপেক্ষিক ব্যয়-বরাদ্দ দিন-কে-দিন কেবলই কমছে সবদেশেই। একমাত্র ব্যতিক্রম জাপান। অতি সম্প্রতি ভারত সরকারও এ কমানোর দৌড় প্রতিযোগিতায় দিব্যি যোগ দিয়ে ব'সে আছেন—যদিও ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতটি এ ব্যাপারে অনেকটাই আলাদা ! পরে এ প্রসঙ্গে আমরা আরো একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো। তার আগে এখনকার ব্যয়-বিন্যাসের চেহারাটি আমরা প্রথমে একটু জরিপ ক'রে নিই।

মৌল গবেষণার দুটি গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান হ'ল আমেরিকা আর ব্রিটেন। তাছাড়া আছে ফ্রান্স, জার্মানী এবং রাশিয়া সহ ইউরোপের নানা দেশ। একেবারে হালফিলের হিসেব অনুসারে মার্কিন সরকার গবেষণা খাতে ব্যয় করেন মোট ব্যয়ের শতকরা তিন শতাংশ। আবার, এই তিন শতাংশের মাত্র দশ থেকে চোদ্দ ভাগ যায় মৌলিক গবেষণায় এবং সত্তর ভাগের কাছা-কাছি ব্যয় ঘটে যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায়—যার পোষাকী নাম 'প্রতিরক্ষা গবেষণা' (সবদেশেরই এই এক পরিভাষা !)। দীর্ঘদিন ধরেই ব্রিটেন, বিশেষ ক'রে মিসেস থ্যাচারের আমল থেকেই, মৌল গবেষণার প্রতি একটা চরম বিমাতৃসুলভ মনোভাব দেখিয়ে আসছে। এখন তা আরো বেড়েছে। আবদুস সালামের মত নোবেল পুরস্কার জয়ী পদার্থবিদরাও তর্কযুদ্ধে নেমে

এবং অনেক লেখাপত্র ক'রেও তা প্রতিরোধ করতে কার্যত ব্যর্থ হয়েছেন। সালাম আক্ষেপ ক'রে ব্রিটিশ সরকারের এই মনোভাবকে 'Infanticide' আখ্যা দিয়েছেন। 1965 সালে ব্রিটেনে মৌল গবেষণায় যেখানে বরাদ্দ ছিল গবেষণা-বাজেটের শতকরা চল্লিশ ভাগ, 1980 সালে তা কমে দাঁড়ায় শতকরা 20 ভাগে। শুধু তাই নয়। গোটা ইউরোপের কণা পদার্থবিদ্যা ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যার তত্ত্বীয় ও পরীক্ষামূলক গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দু হ'ল সংক্ষিপ্ত CERN নামের একটি ইউরোপীয় বহুজাতিক সংস্থা। এবং অতি সম্প্রতি বিশ্ব-সম্মানিত এই গবেষণা-প্রতিষ্ঠান থেকে ব্রিটেন নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে চলেছে স্যার কেন্‌ড্রিউজ কমিটির রিপোর্ট অনুসারে। অতি সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে ফ্রান্স সরকারও 1987 সালে মৌল গবেষণায় তার অর্থনৈতিক বরাদ্দ শতকরা আরো দুই ভাগ কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত করেছেন। পশ্চিম জার্মানীর পরিমাণগত সঠিক তথ্য এ মুহূর্তে হাতে নেই কিন্তু বরাদ্দ যে ক্রম-হ্রাসমান তা কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। 1987'র জানুয়ারিতে 'NATURE'-এর সূত্রে পাওয়া একটি খবর অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে ভারত সরকার এই প্রথম গবেষণা-খাতে তার GNP-র শতকরা পূর্ণ একভাগ ব্যয় করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু দুঃসংবাদটি ঠিক তার পরের ধাপেই। এই এক ভাগের আবার শতকরা মাত্র 14 ভাগ যাবে তত্ত্বীয় মৌলবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায়—যার ফলে মৌল গবেষণায় নেট বরাদ্দ নাকি আসলে কমবেই। আর, এই একভাগের শতকরা 28 ভাগ ব্যয় করা হবে ফলিত ও প্রযুক্তিগত গবেষণায় এবং শতকরা 32 ভাগ খরচ করা হবে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান গবেষণা খাতে—বাদবাকি অংশটুকু সম্পর্কে খবর নীরব। অর্থাৎ তা সামরিক খাতে গবেষণায় বরাদ্দ? হতেই পারে। এতেও, অর্থাৎ এই বৃদ্ধিটুকু (মানে, GNP-র পূর্ণ এক ভাগ) ধরে নিয়েও, ভারতে গবেষণা ব্যয় দাঁড়াবে মাথাপিছু মাত্র 2.6 ডলার যেখানে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোতে তার মান মাথাপিছু 100 থেকে 400 ডলার। একটা কথা এখানে বিশেষ-ভাবে উল্লেখ্য যে ভারতে গবেষণাখাতে সরকারি ব্যয়ই হ'ল মোট ব্যয়ের সিংহভাগ—শতকরা 87'র কাছাকাছি; বাদবাকি 13 ভাগ মাত্র আসে ব্যক্তি-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে। কিন্তু উন্নত দেশগুলোয় প্রাইভেট সংস্থাগুলি থেকে ব্যয়ের হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। সে যাই-হোক, মৌল গবেষণায় মোট ব্যয় যে কমতির দিকে তা সরকারি বেসরকারি সব উদ্যোগ মিলিয়েই।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে এবং উঠছেও—সরকারি তরফে এই ব্যাপক ব্যয় সঙ্কোচন নীতির কারণ কী? যাই-বলা-হোক, আসল কারণটি হ'ল অস্ত্র গবেষণায় হাতে-নাতে ফল দেবার মত লাগসই তেমন কিছু যোগান দিতে পারছেন না কণা-পদার্থবিদ বা অন্য শাখাস্থ তত্ত্বীয় পদার্থবিদ-রসায়নবিদ বিজ্ঞানীরা। নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নানা বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক ঝুটঝামেলায় পড়েছেন দেশবিদেশের শাসকশক্তি। তাছাড়া, নিউক্লিয়ার এনার্জি নিয়েও আছে বিজ্ঞানী মহলে তুমুল বাকবিতণ্ডা—বিশেষত, নিউক্লিয়ার এনার্জি আসলে কতটা ক্লিয়ার (!) সে বিষয়েও বাদানুবাদ স্পষ্ট এবং তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। দেশে দেশে সমাজসচেতন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমত নিউক্লিয়ার আর্মস্‌ এবং নিউক্লিয়ার এনার্জি দুয়েরই চরম বিরোধী। তাই, সরকার এ নিয়ে সব দেশেই প্রায় বেশ বেকায়দায় পড়েছেন এবং সে বেসামাল দশা কাটাতেই দেশে দেশে তাঁদের এই জেহাদ-ঘোষণা—যার প্রথম বলি হচ্ছে মৌল-গবেষণা। এ ব্যাপারে জাপানের ক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যতিক্রম এবং সেটা কীভাবে সম্ভব হ'ল ও হচ্ছে তা একটি আলাদা গবেষণার বিষয় হতে পারে।

না, গবেষণায় অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি নিশ্চয়ই হেলাফেলার ব্যাপার নয়। সব সরকারেরই ক্ষমতা সীমিত কারণ সম্পদের উৎস অফুরন্ত নয় আর সমস্যা হ'ল অগুনতি—যার মধ্যে বেশ কিছুই আছে মোটাদাগের রুটি-রুজির আশু সমস্যা। মানবিক কারণেই হোক বা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্যই হোক, কোন সরকারই তা অগ্রাহ্য করতে পারেন না; করা উচিতও নয়। সুতরাং ব্যয়বরাদ্দে 'গবেষণা' ব্যাপারটি সাঙ্ঘাতিক অগ্রাধিকার পাবে এ পাগুলে প্রস্তাবে কেউ-ই সায় দেবেন না। এর পরেও ব্যবহারিক দৃষ্টিভংগীতে বিচার করলে মানতেই হবে যে গবেষণার মধ্যেও, সাধারণভাবে, ফলিত ও প্রযুক্তিগত গবেষণাই বেশি গুরুত্ব পাবে কারণ, তা অনেক আশু সমস্যার সমাধানে কাজে লাগতে পারে। কিন্তু, এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও সম্ভব—যার উদাহরণ হতে পারে ভারতবর্ষ। একটা সত্য মেনে নেওয়া ভালো যে প্রভূত অর্থব্যয় ক'রে এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও ফলিত গবেষণায় আমরা কোনো কোনো প্রাচ্য দেশ বা নিরানব্বইভাগ পাশ্চাত্য দেশের সমকক্ষ হ'তে পারবো না। কেননা, অনুন্নত (ভাষান্তরে উন্নয়নশীল) অর্থনীতির জন্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যবধান ঘটে গিয়েছে তা অল্পদিনের মধ্যে দূর করা প্রায় অসম্ভব। কোনো পরাজিত মনস্কতা থেকে একথা বলা হচ্ছে না—বলা হচ্ছে বাস্তব অবস্থার রূঢ় স্বীকৃতিতে। কিন্তু, একটি এবং কেবলমাত্র একটিই ক্ষেত্রে এখনও আমরা অন্য সব দেশের সংগে পাল্লা দিয়ে প্রায় সমান-সমান দৌড়তে পারি—সেটি হ'ল তত্ত্বীয় গবেষণার ক্ষেত্র। কিন্তু পারি বলেই দৌড়তে হবে, এরকম যুক্তি হাজির করতে চাই না। নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠতে পারে—এ পারাটা কতটা বাঞ্ছনীয়? কিন্তু বাঞ্ছনীয় নয় এরকম প্রমাণও যেহেতু সম্ভব নয়, তাই অন্তত স্থিতাবস্থা বহাল রাখার সপক্ষেই আমাদের দাঁড়ানো উচিত। তত্ত্বীয় ও পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র মিলিয়ে মৌল গবেষণায় যা ব্যয় হয় তা মোট খরচের এক অতি খণ্ড-ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। সেটুকু বাঁচিয়ে হয়তো এক-আধ বছরের খরা-বন্যার ধাক্কা সামলানোর চেষ্টা করা সম্ভব; কিন্তু কোনো স্থায়ী সমাধানের পক্ষে তা হাস্যকরভাবে অপ্রতুল। এক্ষেত্রে সাশ্রয় করবার চেষ্টা করা তাই, বোধ হয়, খুব একটা কাজের-কাজ হবে না। বরং সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় যেটুকু চিন্তাচর্চা ও অনুশীলনের অভ্যাস এক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে সেটুকু বাঁচিয়ে রাখার (এবং সম্ভব হ'লে তা আরো বিকশিত করার) চেষ্টা করাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা আমাদের দেশের মেধা ও মননশীলতার প্রতি শুধু আমাদের নিজেদের আস্থাই গভীর নয়—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদেরও অনেকেই এর স্বীকৃতি ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এর

কারণ, বোধ হয় এই যে, তত্ত্বীয় গবেষণায় আমাদের দীর্ঘদিনের একটা আবহ ও ঐতিহ্য আছে—যা কম্পুটার সংস্কৃতিতে নেই, যা প্রয়োগমুখী বিজ্ঞান গবেষণায় নেই। এবং গবেষণায় অগ্রাধিকার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার আগে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রসঙ্গটি প্রয়োজনের ওজনের পাশাপাশি ফেলেই ভাবতে হয়। গবেষণায় অগ্রাধিকার প্রশ্নে এরকম আরো অনেক বিবেচনার দিক আছে। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটিতেও আমাদের সরকার তার মৌলিকতা দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছেন, যার ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞাননীতির অগ্রাধিকারের সব দিক ও অভিমুখের কার্বন কপি ক'রে ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণায় মৌল গবেষণার গুরুত্বকে খাটো ক'রে দেখছেন এবং ক্রমাগত ব্যয় সঙ্কোচন ঘটাচ্ছেন।

আর, সরকার এসব করছেন একটি অছিলার ভিত্তিতে যে তত্ত্বীয় গবেষণায় বিজ্ঞানীরা সব 'মিডিওকার' গবেষণা করছেন—চমৎকারিত্বের অভিমুখ ও প্রচেষ্টা নাকি তাঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে অনুপস্থিত। এই উৎকর্ষ (excellence) বা চমৎকারিত্বের প্রশ্নটি নিয়ে আজকাল এদেশের বিজ্ঞাননীতি নির্ধারকদের মধ্যে খুবই কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু চমৎকারিত্বের অভাব তো শুধু তত্ত্বীয় গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গত তিরিশ বছরে এদেশে ফলিত ও প্রযুক্তি গবেষণায়ই বা কোন্ উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে—পরীক্ষামূলক গবেষণায়ই বা হয়েছে কোন্ যুগান্তকারী অভিনব কাজ? তাহলে আজ, 1947-এর চল্লিশ বছর পরেও কেন নতুন ক'রে 'ফরেন নো-হাউ' কিনতে হয়, কেন শিথিল করতে হয় 'ইম্পোর্ট লাইসেন্স'-এর নিয়মাবলী! আর, এসবই তো একেবারে হালফিলের হাঁড়ির খবর! কিন্তু, এই উৎকর্ষ হ্রাসের অজুহাত দেখিয়ে ব্যয়সঙ্কোচনের খাঁড়াটা কেবলি নেমে আসছে মৌল গবেষণার ওপর! প্রতিবাদ ও আপত্তির কেন্দ্রবিন্দুটি হ'ল এই একপেশেপনারই বিরুদ্ধে।

সত্যি কতখানি প্রয়োজন মৌলবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা? নাকি এ শুধু প্রসাধন? এ প্রশ্নের জবাবে প্রথমেই বলি: এ হ'ল এক মস্ত সাধন—আর অন্য দশটি ক্ষেত্রের মত যেখানে সবাই সমান সফল নন। অর্থাৎ সবাই সি. ভি. রমন, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা বা সত্যেন বসু না-ও হ'তে পারেন। কিন্তু সবার যোগফলেই সৃষ্টি হয় একটা সমগ্রতা, যার বিকাশ অবশ্যই প্রয়োজন ভবিষ্যতের মানুষের মুখ চেয়ে। নিছক আজ-কাল-পরশুর যোগফলই আমাদের জীবন নয়; হয়তো একেবারে এখনকার কথা ভাবলে এ মুহূর্তে কোনো একটি মৌল গবেষণার প্রয়োজন সত্যই শূন্য। কিন্তু, হতে পারে, হয়ও, যে বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ বছর পরে সে-ই ধরা দেবে পূর্ণিমার পূর্ণতা নিয়ে এবং কঠোর বাস্তবের প্রয়োজনে এবং আয়োজনে। আসলে, মৌল গবেষণায় নিয়োজিত মনীষা সৃষ্টি করে একটা সূক্ষ্ম রুচি ও দৃষ্টি—যার অভাব ঘটলে সৃষ্ট মানবসভ্যতা সত্যি যাবে রসাতলে। মৌল বিজ্ঞানের প্রতি অন্ধ বিরূপতা ও বিমুখতা, শেষ বিশ্লেষণে, তাই একটি সংস্কৃতি-বিরোধী অপপ্রয়াস—যা বানচাল করা সমাজ-সচেতন প্রতিটি সংস্কৃতিবান নাগরিকের কর্তব্য।

সাবধান! ওপরওয়ালা নজর রাখছে॥

কোনো দেশই চায় না, অন্য দেশের সমরোপকরণের মান তার নিজের প্রতিরক্ষা-আয়োজনকে ছাড়িয়ে যাক। প্রতিটি বৃহৎশক্তি সে কারণে অন্য দেশের অস্ত্র উৎপাদন ও উদ্ভাবনের ওপর অনবরত নজর রেখে চলেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নানা উপায়ে তথ্য সংগ্রহ ও নজরদারির দ্বারা অপর দেশের গোয়েন্দাগিরিকে নিষ্ফল করার চেষ্টা।

কৃত্রিম উপগ্রহের দাপট

দূর থেকে সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ উন্নততর হয়েছে। 1963 সালের Limited Test Ban Treaty কার্যকর হতে পেরেছিল Vela Hotel Satellite গুলির জন্য। এগুলির সাহায্যে দূর থেকে কোন আকস্মিক আলোর ঝলক বা পারমাণবিক বিস্ফোরণ সঞ্জাত গামারশ্মি বিচ্ছুরণের সন্ধান রাখা যেত।

এখন আমেরিকা মোট তিন ধরনের তথ্য সংগ্রহকারী উপগ্রহ ব্যবহার করে। KH-II উপগ্রহ আকাশে 240 থেকে 530 কিলোমিটার উচ্চতায় থাকে; এতে থাকে Multispectral scanner এবং দৃশ্যমান আলোক ও অবলোহিত বিকিরণের সেন্সর। "Big Bird" উপগ্রহ অবস্থান করে 160 থেকে 280 কিলোমিটার উচ্চতায়; ব্যবহার করে উচ্চ বিভাজন ক্ষমতা সম্পন্ন (high resolution) ক্যামেরা এবং multispectral এবং infrared scanner। এছাড়া "close look" নামক উপগ্রহ 130—300 কিলোমিটার উচ্চতা থেকে ভূপৃষ্ঠের রঙীন ছবি তোলে। এদের বেশীরভাগই মাত্র 5 থেকে 15 সেমিঃ লক্ষ্যবস্তুকেও আলাদা করে চিনিয়ে দিতে পারার শক্তি রাখে।

দূর থেকে তথ্য সংগ্রহকারী অন্যান্য কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে আছে Rhyolite—এটি প্রায় 36000 কিলোমিটার উচ্চতায় ভূসমলয় কক্ষপথে অবস্থান করে ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহ করে থাকে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর আড়িপাতার কাজ করে।

নতুন ধরনের সংবেদকগুলি আজকাল এমনকি কারখানা থেকে নির্গত গ্যাসের উপাদানও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছে অবলোহিত বর্ণালী বিশ্লেষণের সাহায্যে। এদের সাহায্যে সহজেই রাসায়নিক বা জৈব অস্ত্রের উৎপাদনের ওপর নজর রাখা যেতে পারে। এমনকি প্লুটোনিয়াম বা ট্রাইসিয়াম উৎপাদক রিঅ্যাক্টরগুলির উপরেও।

সোভিয়েটরাও বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রাহক উপগ্রহের ব্যবহারে পিছিয়ে নেই। তারা ইদানীং Digital Imagery Satellite প্রচলনের চেষ্টা করছে ; এই উপগ্রহগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে ছবি প্রেরণ করতে সক্ষম। ফ্রান্স ইতিমধ্যে "Spot" নামে এক ধরনের উপগ্রহ বাজারে ছেড়েছে, যেটি প্রতি আড়াই দিন পরে ভূপৃষ্ঠের কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে পরিদর্শন করতে পারে। ফ্রান্সের পরিকল্পনা রয়েছে আগামী 1990 সালের মধ্যে "Spot"-এর একটি মিলিটারী জুড়ি তৈরি করার, যার নাম দেওয়া হয়েছে Helios। এর বিশ্লেষণ ক্ষমতাও "Spot" এর থেকে বেশি হবে।

ভূপৃষ্ঠে নজরদারি

ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাও এই জাতীয় নজরদারির আওতার মধ্যে পড়ে। টেলিফোনের লাইনে আড়িপাতা বা বেতার যন্ত্রে সংবাদ আদানপ্রদানের সময়ে আড়িপাতা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ছোট-খাটো কম্পিউটারের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেলিফোন ব্যবস্থার সমস্ত 'ডায়াল টোন'গুলির মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া যেতে পারে উদ্দিষ্ট টেলিফোন নম্বরটি। কম্পিউটারকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করা যেতে পারে যাতে কোনো বিশেষ নম্বরের সঙ্গে কথোপকথন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটি ম্যাগনেটিক টেপে একটি টেপরেকর্ডার চালিয়ে দেয়। এ সমস্ত যন্ত্রের খরচ অপেক্ষাকৃত কম। ফলে অল্প খরচেই হাজার হাজার কথোপকথনের ওপর আড়ি পাততে পারা যায়। এমনকি, টেলিফোনের কথাবর্তা যদি খুব তাড়াতাড়ি বা জড়ানভাবে বলা না হয়ে থাকে তবে কথোপকথনের বিষয়বস্তু থেকে প্রয়োজানীয় সংবাদটি বেছে নেওয়া এবং প্রাসঙ্গিক দু-একটি শব্দ উচ্চারিত হলেই গোটা কথোপকথনটিকে রেকর্ড করে নেওয়ার কাজটিও কম্পিউটার করতে পারে। প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত দেশগুলিতে বিভিন্ন এম্‌ব্যাসীর কম্পিউটারগুলি নিয়মিতভাবে আড়িপাতার কাজে ব্যবহৃতও হয়।

চিচিং ফাঁক ও চিচিং বন্ধ

নজরদারি ও তথ্য সংগ্রহের যাবতীয় কার্যকলাপের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহার। সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে বার্তা আদান প্রদানের সময় সর্বদা সচেতন থাকতে হয় যাতে অন্য কেউ তার মর্মোদ্ধার না করতে পারে, বা তার মধ্যে কোন মেকী সংবাদ জুড়ে দিতে না পারে।

শক্তিশালী কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক সংযোগব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্কেতিক লিপির লেখক এবং সঙ্কেতের পাঠোদ্ধারকারী উভয়েরই কাজ আরো জটিল হয়েছে। বছর দশেক আগে সাঙ্কেতিক ভাষার তথ্যকে অনুবাদ করার ব্যাপারে এক নতুন পদ্ধতির সন্ধান দেন W. Diffie এবং M. Hellman নামে দুজন আমেরিকান প্রযুক্তিবিদ। এই পদ্ধতিতে, (যার নাম Public Key Cyptography) সাঙ্কেতিক লিপির প্রস্তুতি ও পাঠোদ্ধারের কৌশল এমন যে তথ্যকে সাঙ্কেতিক ভাষায় অনুবাদের কাজটি যে কেউ করতে পারে ; কিন্তু সাঙ্কেতিক ভাষার পাঠোদ্ধার করতে পারে একমাত্র উদ্দিষ্ট প্রাপক। Public Key Cypotlogyর সাহায্যে এমন সমস্ত বার্তাসংকেতের পরিকল্পনা করা গেছে যেগুলির মর্মোদ্ধার করা কার্যত প্রায় অসাধ্য।

[টাইমস অব ইণ্ডিয়ার 14ই মে 1987 সংখ্যার প্রকাশিত **সুভাষ কক**-এর লেখা Beware : Big Brother is Watching You-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এটি। অনুবাদ করেছেন—**সুরশ্রী চৌধুরী**।]

With Best Compliments From :

Eastern Enterprise

Engineers & Fabricators

2-G ONRAIT SECOND LANE
CALCUTTA-700 014

Phone :
24 4183 (Office)
24 0902 (Works)

"মাটি খাওয়া রোগ"

স্মরজিৎ জানা

গ্রামাঞ্চলে 'মাটি খাওয়া রোগ' নামে অভিহিত উপসর্গটির ব্যাখ্যা ঠিক জানা নেই। সম্ভবত রক্তাল্পতাই এর কারণ ... প্রসঙ্গত, পশুদের ভিতরও ক্ষেত্রবিশেষে অখাদ্য খাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়—এরও প্রকৃত কারণ জানা নেই। সঙ্গের দ্বিতীয় লেখাটিতে থাকছে এ বিষয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ্রামাঞ্চলে বিশেষত কিছু কিছু বাচ্চা ছেলে এবং বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের ভেতর মাটি বা ছাই ইত্যাদি খাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়। সাধারণ মানুষেরা এই বাজে ধরনের 'অভ্যেসটিকে' বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ ক'রে থাকেন। এমন কি ভূত বা অশরীরী প্রভাব বলেও অনেকের ধারণায় তা প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত প্রশ্ন তোলা উচিত আদৌ এটা অভ্যেস কিনা, আর যদি তা অভ্যেস হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে, তার পেছনের কারণটিই বা কি। আর এতকিছু বিভিন্ন ধরনের খাবার দাবার থাকতে এমন বিচ্ছিরি একটা খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে তারা গেল কেন।...এ নিয়ে কিছু গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। তাতে এই ধরনের স্ত্রী-পুরুষদের পেটে হুকওয়ার্মের উপস্থিতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেছে। এছাড়া ঐ সমস্ত ছেলে মেয়েদের খড়িমাটি ইত্যাদি খাওয়ার প্রবণতা ছাড়াও আরো কয়েকটি লক্ষণ ও উপসর্গ একসঙ্গে থাকতে দেখা যায়। সাধারণত এরা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে থাকে, একটুতে ক্লান্তি অনুভব করে, প্রায়ই হাই তোলে। কোনো কাজকর্মে উৎসাহ পায় না। বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও খেলাধুলায় অনীহা, একটা ঝিমধরা ভাব লক্ষ্য করা যায়। শারীরিক অবসাদ মানসিক অবসাদেও পর্যবসিত হতে দেখা যায় এদের বহুজনের ক্ষেত্রে। এইসব উপসর্গ ও লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর পেছনের কারণটি বহুক্ষেত্রে "রক্তের অভাবের" দরুন ঘটে থাকে। "রক্তের অভাব" বলতে সাধারণত কিন্তু রক্তের পরিমাণের অভাব বা কমতিকে চিহ্নিত করে না। আমাদের শরীরের রক্তে যে লোহিত কণিকা রয়েছে তার মধ্যে থাকে হিমোগ্লোবিন। এই হিমোগ্লোবিন শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। রক্তের হিমোগ্লোবিন, ফুসফুসে প্রশ্বাসের সঙ্গে যে অক্সিজেন আমরা নিয়ে থাকি তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সারা শরীরের কোষে কোষে তা পৌছে দেয়। আবার কোষ থেকে বর্জিত কার্বন ডাই-অক্সাইড বহন করে তা নিয়ে আসে ফুসফুসে, যা নিশ্বাসের সঙ্গে আমরা ছেড়ে দিই। রক্তে এই হিমোগ্লোবিনের গুণগত বা পরিমাণগত ঘাটতি ঘটলে তাকেই ডাক্তারী ভাষায় বলে অ্যানিমিয়া (Anaemia), যার বাংলা প্রতিশব্দ হোলো রক্তাল্পতা। আর এই হিমোগ্লোবিন তৈরিতে যে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদানের প্রয়োজন তা হোলো লোহা বা আয়রন। "রক্তাল্পতা" লোহা ছাড়া ফোলিক অ্যাসিড বা ভিটামিন বি-এর অভাবেও ঘটতে পারে। তবে আমাদের দেশে সাধারণভাবে যাঁরা রক্তাল্পতায় ভোগেন তার পেছনের গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হোলো এই লোহার অভাব। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে ছোট ছোট বাচ্চাদের (পাঁচ বছরের নিচের) এবং গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে এই রক্তাল্পতার হার 50% থেকে 60%। এমনকি গ্রামাঞ্চলে পুরুষদের ভেতরও দেখা গেছে 40% মানুষকে রক্তাল্পতায় ভুগতে। এসব ক্ষেত্রে আয়রনের অভাবটাই প্রধান কারণ। আমরা আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় লোহা বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য থেকে পেয়ে থাকি। মাছ, মাংস, ডিমে যথেষ্ট পরিমাণ আয়রন রয়েছে। আয়রন রয়েছে ডাল, বাদাম এবং সবুজ শাকসব্জীতে। কিন্তু গরীব মানুষেরা খাদ্যের উপাদান হিসেবে শাকপাতা ও নানান ধরনের সস্তার আনাজপত্র ব্যবহার করলেও রক্তাল্পতার হার তাদের মধ্যেই বেশী। কারণ এইসব খাদ্যদ্রব্যে উপস্থিত ফাইটেট (Phytate) ও অক্সালেট (Oxalate) আয়রনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। শরীরে শোষিত হয় না। গ্রামের মানুষদের এই সমস্যাটা আরো তীব্র করে তোলে হুকওয়ার্ম নামক কৃমির প্রাদুর্ভাব। এই কৃমি আমাদের খাদ্যনালীতে বাসা বাঁধে এবং নালীর গা ফুটো ক'রে রক্ত শোষণ করে। দেখা গেছে এক একটা হুকওয়ার্ম প্রতিদিন কয়েক সিসি রক্ত শোষণ করে। তাছাড়া ক্ষুদ্রান্ত্রের দেওয়ালে তারা যে ক্ষত সৃষ্টি করে তা চুঁইয়েও প্রচুর রক্ত নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, এখন মনে করা হচ্ছে হুকওয়ার্ম-এর শরীর থেকে এক ধরনের পদার্থ নিঃসৃত হয় যা আমাদের মজ্জার ভেতর রক্তকোষ তৈরীতে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে আমাদের শরীর তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে পারে না। যে পরিমাণ লোহা এই ধরনের রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে নষ্ট হয় তা পূরণ করা আরো দুষ্কর হয়ে পড়ে। মেয়েদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরো বেশী, কারণ প্রতি মাসে ঋতুস্রাবে আরো কিছু পরিমাণ রক্ত নষ্ট হয়। আর গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে গর্ভস্থ শিশুর জন্য অতিরিক্ত লোহা সরবরাহ করার জন্য তার শরীরে লোহার ঘাটতি তুলনামূলক ভাবে বেশী পরিমাণে দেখা দেয়। পর্যাপ্ত হিমোগ্লাবিন তৈরি হতে না পারার দরুন শরীরের কোষগুলি প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব বোধ করে। ফলে এরা অল্পেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বারংবার হাই তোলে। শুধু তাই নয়, শরীরে লোহার অভাব শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে পঙ্গু করে রাখে। তাই লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঐ সব মাটি খাওয়া রুগীরা প্রায়শই নানান ধরনের রোগে ভুগে থাকেন। আরো দেখা গেছে রক্তাল্পতা, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে শিক্ষালাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটার সেরোটনিন তৈরিতে রক্তের এই ঘাটতি সমস্যা সৃষ্টি করে। আর গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে মা এবং শিশুর স্বাস্থ্য, প্রসবের সমস্যা জটিলতর ও বিপদসংকুল করে তোলে রক্তাল্পতার সমস্যা।

এবার প্রশ্নটা দেখা দিতে পারে, মাটি খাওয়ার সঙ্গে এর কি সংযোগ ? খুব সঠিকভাবে তা বলা সম্ভব নয়। কি ধরনের শারীরবৃত্তীয় ঘটনা কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এই বিকৃত রুচির জন্ম দেয় তা বলা দুষ্কর। তবে অনুমান করা হয় শরীরে পর্যাপ্ত লোহার অভাবই এই ধরনের রুচিতে অভ্যস্ত করে তোলে কিছুজনাকে। হুকওয়ার্ম এই রক্তাল্পতা তৈরির পেছনের একটি কারণ। অথবা হুকওয়ার্ম-এর সঙ্গে এই রুচির অন্য কোন যোগাযোগ রয়েছে কিনা তা অবশ্য ভাববার বিষয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হুকওয়ার্ম ছাড়াও ঐ অভ্যেসে ভুগতে কিছুজনাকে দেখা যায় এবং তাদের মধ্যেও রক্তাল্পতার প্রাবল্য খুব গভীর। এই সমস্ত রুগীদের পর্যাপ্ত আয়রন বা লোহাঘটিত ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করলে এই বিকৃত রুচিটি চলে যেতে দেখা গেছে। তবে সত্যিকারের কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে গেলে যে ধরনের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার তা আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে করা হয় না। এদেশের মানুষদের সাধারণ রোগ বা বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা করার ব্যাপারে সরকারী তরফেও উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই 'মাটি খাওয়া' ও রক্তাল্পতার সম্পর্কের বিষয়টা নিয়ে আরো অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন।

সূত্র ঃ

K. D. Chatterjee : Textbook of Parasitology.

অখাদ্য খাওয়া রোগ—পশুতে

সুকুমার সাহা

লক্ষ্য করলে মাঝে মধ্যেই দেখতে পাবেন গোরু সামনে যাই দেখছে তাই খেতে চেষ্টা করছে। বাছাবাছির কোনো ব্যাপার নেই। একটা কিছু পেলেই হোলো। ছেঁড়া নেকড়া থেকে শুরু করে কাঠ, হাড়, মাটি—কিছুই বাদ দিচ্ছে না। এই অবস্থায় এদের খিদে বেড়ে কয়েকগুণ হয়ে যায়। রোগটি গোরু ছাড়াও শুয়োর, ছাগল, ভেড়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় এর পরিচিতি পিকা (Pica) বা অ্যালাট্রিওফাজিয়া (allatriophagia) নামে।

প্রশ্ন হোলো, কেন এমন হয় ? কতকগুলো কারণে এটি হতে পারে। এক, খাদ্য সুষম না হলে। অর্থাৎ খাদ্যে কতগুলো খনিজ লবণ (প্রধানত ফসফরাস, এ ছাড়া আয়রন ও কোবাল্টের লবণ) অথবা প্রোটিনের অভাব এর একটি কারণ। দুই, পাকস্থলী এবং উদরের আবরক ঝিল্লী বা পেরিটোনিয়াম-এর প্রদাহ থেকে দীর্ঘস্থায়ী উদরের ব্যথা এবং হজমের গণ্ডগোলও এর কারণ হতে পারে। তিন, রেবিস্ (মানুষের ক্ষেত্রে এই রোগই জলাতঙ্ক বলে পরিচিত) বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের গোলোযোগ এই রোগের কারণ।

পিকা নিচের কয়েক রকমের হতে পারে। এই অবস্থায় গোরুর যদি শুধু হাড় চেবানোর দিকে লক্ষ্য থাকে তবে তাকে বলে অস্থিওফাজিয়া। ইনফান্টোফাজিয়ায় শুয়োর নিজের বাচ্চাকে খেয়ে ফেলে। আর এমনও হতে পারে, এই রোগে আক্রান্ত পশু নিজের পায়খানা খেয়ে ফেলছে। এই পরিস্থিতি হলে তাকে বলে কপ্রোফাজিয়া। ভেড়া এই রোগে উল খেতে শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্ত প্রাণীকে চামড়া চিবোতে দেখা যায়।

পিকায় আক্রান্ত শুয়োর দলবদ্ধভাবে থাকাকালীন একটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় আক্রান্ত শুয়োর অন্যান্য শুয়োরগুলোর লেজ কামড়ে ধরে। এর থেকেই আস্তে আস্তে তারা কান কামড়ানোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে অনেক ফার্মে জন্মের প্রথম কয়েকদিনের মধ্যে যখন তাদের ধারাল দাঁত (needle teeth) কেটে ফেলা হয় তখন লেজও কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

এই ভাবে পিকার ফলশ্রুতি ক্যানিব্যালিজম্ (cannibalism) অনেক পশুর মৃত্যু ঘটায়। এটা বিরাট আর্থিক ক্ষতি। এছাড়া লেড পয়জনিং, বটুলিজম এর সাধারণ পরিণতি। পথে ঘাটে খাওয়া বিভিন্ন জিনিস, উল, কাপড় অথবা বালু পৌষ্টিকতন্ত্রের পক্ষে বাধার সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় ধারাল কোনো বস্তু খেয়ে ফেললে তা গলবিল অথবা পাকস্থলীতে বিঁধে যেতে পারে। এর ফল মারাত্মক। এই অবস্থায় আক্রান্ত প্রাণীর মাঠে চরে খাওয়ার প্রতি আগ্রহ কমে যায়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিকার প্রকৃত কারণ নির্ধারণ সম্ভব হয় না। তাই চিকিৎসা হয় ট্রায়াল অ্যাণ্ড এরর (trial and error) পদ্ধতিতে।

সূত্র :

1. Veterinary Medicine (5th edition, page-5) by D.C Blood, J.A. Henderson, O.M. Radostits.
2. A Textbook of Animal Husbandry (5th edition, page-280) by G.C. Banerjee.

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী (বি-ও-বি)-তে গত দশ বছরে বিভিন্ন লেখায় চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের নানা দিক আলোচিত হয়েছে। তারই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'তে

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

সুদীপ্ত সরস্বতী

জনস্বাস্থ্যের কয়েকটি দিক

"বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"র প্রথম সংখ্যাতেই এদেশের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাচিত্রের ছায়া পড়েছে।

খাদ্য, জল, বাতাস, বস্ত্র, বাসস্থান—এক একটা স্তম্ভ যাদের ওপর ভর দিয়ে স্বাস্থ্য প্রাথমিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ শরীরকে চালু রাখার জন্যে দরকারি ন্যূনতম ক্যালোরি ও প্রোটিন পাওয়ার মতো খাবার আর পানীয় জল বেশি সংখ্যক মানুষেরই নাগালের বাইরে। তবে ক্রমাগত বেশি বেশি মানুষ মানুষের তৈরি বিষের নাগালের মধ্যে আসতে শুরু করেছে।...দেশে দেশে নতুন নতুন "ভূপাল" বসানো হচ্ছে, একটা "চের্নোবিল" ঘটে যাবার পরও "পরিচ্ছন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ তৈরি" পুরোদমে চলছে, মহাকাশে পরমাণু শক্তি চালিত গোয়েন্দা উপগ্রহ পাঠানো হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নাম করে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে, তেজস্ক্রিয় খাদ্য তৃতীয় বিশ্বের মানুষজনের মুখে তুলে দেয়া হচ্ছে, নিজের দেশে নিষিদ্ধ কীটনাশক অন্য দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে, চাষের জমিতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে কীটনাশক রাসায়নিক ছড়ানো হচ্ছে। এসব কাণ্ডকারখানায় পরিবেশে জমা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় এবং রাসায়নিক বিষ, যা বাতাস জল আর খাবারের সঙ্গে মিশে শরীরে ঢুকে পড়ছে আমাদের অজান্তেই।... ধীরে ধীরে শরীরবৃত্তে জমা হচ্ছে বিপর্যয়ের মেঘ।...দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই মানুষের তৈরি বিষে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কারণ, লাগাতার অপুষ্টি ওদের শরীরের দরজা রোগজীবাণুদের ঢোকার জন্যে খুলে রাখে। শরীর সহজেই সংক্রামক রোগের কবলে পড়ে। সংক্রামক রোগ আবার অপুষ্টির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। অপুষ্টি আর সংক্রামক রোগের চোরাবালিতেই তলিয়ে যায় এদেশের বেশিরভাগ মানুষের জীবন।...অপুষ্ট দেহ সংক্রামক রোগের আশ্রয় ঠিকই তবে কুসংস্কারচ্ছন্ন, অশিক্ষিত সমাজের মনও অনেকসময় কুষ্ঠের মতো রোগ নির্মূল করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কুষ্ঠ, যক্ষ্মা এসব রোগের ব্যাপারে সুস্থ সামাজিক চেতনা গড়ে তোলাটাও তাই জরুরী। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"র নানা সংখ্যায় জনস্বাস্থ্যের এসব দিক আলোচিত হয়েছে।

আন্ত্রিক 1984 : "মানুষের তৈরি মহামারী ?"

স্বাধীনতার চার দশক পরেও দেশের বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের বন্দোবস্ত নেই, নেই জলনিকাশী ও অন্যান্য ন্যূনতম পারিবেশিক ব্যবস্থা। তাই এদেশে বিশেষ ক'রে গ্রীষ্মের খরার মাসগুলোতে পেটের অসুখে শ'য়ে শ'য়ে মানুষের মৃত্যু সাংবাৎসরিক বিধিলিপি হিসেবেই চলে আসছিল। ব্যতিক্রম ঘটল উনিশশো চুরাশিতে। সেবার প্রায় লাখ খানেক লোককে ভুগিয়ে এবং আড়াই হাজারেরও বেশি লোকের প্রাণহানি ঘটিয়ে (সরকারি হিসেব) আন্ত্রিক মহামারী একটা বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি করল। হঠাৎ কেন এই মহামারী ? এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা একটি সেমিনারের আয়োজন করে। বি-ও-বি'তে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এই মহামারীর পেছনে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো মহলের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোনো দুষ্কৃতি জড়িত ছিল কি না সে বিষয়ে সরকারি তদন্তের দাবি ওঠে সেমিনারে। তবে কেউ আন্ত্রিকে আক্রান্ত হলে রোগীর চারপাশের অ-ডাক্তার লোকেদের কী করণীয় এবং আন্ত্রিক বা ডায়ারিয়ার ওষুধের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি ও ওষুধ কোম্পানির কেলেঙ্কারি সম্পর্কে বি-ও- বি'তে আলোচনা থাকলে ভালো হোতো।

হেপাটাইটিস 1985

আন্ত্রিকের রেশ কাটতে না কাটতেই উনিশশো পঁচাশিতে কলকাতা ও আশেপাশের কয়েকটি জায়গা থেকে সংক্রামক হেপাটাইটিসের (যার একটা উপসর্গ জণ্ডিস) উদ্বেগজনক রিপোর্ট আসতে লাগল। বি-ও-বি'তে প্রশ্ন উঠলো, "আবারো কি একই রকম নিষ্ক্রিয়তা, অজ্ঞতা আর শঠতার খেলা দেখাবে সরকারি দপ্তরগুলো, স্বাস্থ্য বিষয়ক নামীদামী সংস্থা আর আমলা তথা বিশেষজ্ঞেরা ?" অথচ বি-ও-বি, হেপাটাইটিসের প্রাদুর্ভাবের কারণ অনুসন্ধানে এগোতে পারত। তাছাড়া "জণ্ডিস"-এর চিকিৎসা ও পথ্য বা নিয়মকানুন সম্পর্কে যেসব বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা ও ধ্যানধারণা চালু আছে বি-ও-বি সেগুলোর বিশ্লেষণে মন দিতে পারত।

ম্যালেরিয়া-এনসেফেলাইটিস

বেশ কয়েকবার এনসেফেলাইটিস ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময় বি-ও-বি'তে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। তবে ম্যালেরিয়া-এনসেফেলাইটিসের মতো মশাবাহী রোগ সম্পর্কে বি-ও-বি'তে আরো অনুসন্ধানভিত্তিক আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

হোমিওপ্যাথি, বিজ্ঞান ও বি-ও-বি

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত কিনা, সে বিষয়ে বিতর্কের মঞ্চ হয়েছিল বি-ও-বি। "হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান" নামে বি-ও-বি'তে প্রকাশিত বিতর্কমালার একটি সংকলনও বেরিয়েছে। এই সংকলনটি বি-ও-বি'তে আলাদাভাবে পর্যালোচিত হওয়ার দাবি রাখে।

আকুপাংচার ও বিজ্ঞান

আকুপাংচার চিকিৎসায় শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ক'রে তোলা যায় কি না, সে বিষয়ে কলকাতায় রতনলাল ব্রহ্মচারী ও

আরো কয়েকজন উৎসাহী বিজ্ঞানকর্মী] তথা বিজ্ঞানী স্বেচ্ছায় একটি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন 1980-তে। এর রিপোর্ট বি-ও-বি'তে বেরোয়। অসাড়তা সৃষ্টিতে আকুপাংচারের ভূমিকা নিয়েও মূল্যবান লেখা বি-ও-বি'তে বেরিয়েছে। তবুও বিজ্ঞানের নিরিখে আজ আকুপাংচার সত্যিসত্যিই কোথায় দাঁড়িয়ে, সে বিষয়ে আরো আলোচনা হওয়া খুবই দরকারি।

ক্যানসার : বিভ্রান্তি ও বিজ্ঞান

ক্যানসার সারানোর ব্যাপারে অসংখ্য ভিত্তিহীন দাবী অতীতে হয়েছে, এখনো হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। কেউ কবিরাজি, কেউ হোমওপ্যাথিক, কেউ বা যৌগিক দাওয়াই বাতলাচ্ছেন কোনোরকম বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই। এতে সাধারণ মানুষ যাতে অযথা বিভ্রান্ত না হন সেজন্যে বি-ও-বি এ বিষয়ে আলোচনা প্রকাশ করেছে। তবে ধূমপান, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, শাকসবজির সঙ্গে ক্যানসারের সম্পর্ক নিয়ে চালু ধারণাগুলোর বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে।

আমরা কেন গিনিপিগ হবো?

একটা হিসেব অনুযায়ী, আমাদের দেশে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, যেটাকে আজও বহু লোক "অ্যালোপ্যাথি" বলে যাচ্ছেন, আজ অবধি মাত্র পাঁচ শতাংশ লোককে উপকৃত এবং কুড়ি শতাংশ লোককে প্রান্তিকভাবে স্পর্শ করতে পেরেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র মতে দু'শোটির কিছু বেশি এবং হাথি কমিটির মতে একশো সতেরোটি মৌল ওষুধই (basic drugs) বেশির ভাগ রোগ প্রতিকারের পক্ষে যথেষ্ট। অথচ ভারতের বাজারে মৌল ও ফর্মুলেশন মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ওষুধ চালু আছে। অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক, বিদেশে অপ্রচলিত বা বিপজ্জনক বিবেচনায় নিষিদ্ধ নানান ওষুধে বাজার ছেয়ে আছে (বি-ও-বি, মার্চ-এপ্রিল 1982)। অ্যান্টিবায়োটিক, কর্টিকোস্টেরয়েডের মতো জীবনদায়ী ওষুধগুলোও অপব্যবহারের ফলে নতুন নতুন রোগের জন্ম দিচ্ছে, সময় সময় জীবনহানিরও কারণ হচ্ছে। তাছাড়া ভেজাল ওষুধ তো আছেই। এরকম গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো রয়েছে নতুন নতুন জৈবরাসায়নিক পদার্থকে ওষুধ হিসেবে বাজারে ছাড়া নিরাপদ কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্যে এদেশের মানুষকে পিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করবার চক্রান্ত। 1974-76 সালে বেলেঘাটা-মানিকতলার বস্তি এলাকায় হাজার হাজার মানুষের ওপর কলেরা রিসার্চ সেন্টারের (এখনকার ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব কলেরা অ্যাণ্ড এণ্টেরিক ডিজিজেজ) তরফ থেকে দুটি নতুন ওষুধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়, এরকম অভিযোগ তোলেন ঐ প্রতিষ্ঠানেরই কয়েকজন মানবতাবাদী বিজ্ঞানী। হাল আমলে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ভারত সরকারের নির্দেশে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR) ভারতীয় নারীদের ওপর গর্ভনিরোধক ইঞ্জেকশন (injectible contraceptive) নেট-এন (NET-EN) প্রয়োগ ক'রে দেখছেন, কী হয়। অথচ আমেরিকার মতো উন্নত দেশে নেট-এন ওষুধ হিসেবে ছাড়পত্রই পায়নি। মানুষের ওপর এ ধরনের অমানবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধে বি-ও-বি সোচ্চার হয়েছে (বি-ও-বি, নভে-ডিসে 1981, মার্চ-এপ্রিল 1985)।

চিকিৎসকের অবহেলায় রোগী মরবে কেন?

উনিশশো তিরাশিতে এ রাজ্যের জুনিয়ার ডাক্তাররা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের পথে পা বাড়ান। এই আন্দোলন অবহেলিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে যে মৌলিক প্রশ্নগুলো তুলে ধরেছিল, তা এড়িয়ে বেশি দূর যাওয়া যায় না ঠিকই। তবে এক পাঠকের বক্তব্যকেও বি-ও-বি ফেলতে পারেনি : "মজা হচ্ছে এই যে, যদি আলাদিন এসে রাতা রাতি একটি সুন্দর মনোমত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ডাক্তারবাবুদের উপহার দিয়ে যান, তবে কি পরিস্থিতিটা পালটে যাবে? এখানে যাঁরা বিজ্ঞানী, হাসপাতালের চিকিৎসকবৃন্দ, ভণ্ডামি, সংস্কার আর চূড়ান্ত অবহেলার পৃষ্ঠপোষক এঁরা নিজেরাই। ডাক্তারবাবুদের আন্দোলন আর বিজ্ঞান বাবুদের চলতি 'আন্দোলন' এগুলোকে আড়াল ক'রে রাখে নির্ভাবনায়। ব্যতিক্রম এখনো ব্যতিক্রম বই কিছু নয়।

"হাসপাতালে প্রায়ই মারামারি হয়, কাগজ মারফত আমরা জানতে পারি, কর্তব্যরত চিকিৎসক নিগৃহীত হয়েছেন। কেন? ডাক্তারবাবুরা বলেন—আসলে লাইফ সেভিং ড্রাগ নেই, এক্সরে নেই, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলো নেই, কিছু করতে পারা যাচ্ছে না। শোকাহত মানুষ হাতের সামনে পাচ্ছেন ডাক্তারবাবুকে—। খোঁজ নিয়ে দেখুন, ওষুধ কিম্বা রক্ত নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযোগ, ডাক্তারবাবুরা মুমূর্ষু রোগীর কাছে এলেনই না। কর্তব্য তো পরের কথা, কেউ চেম্বারে আছেন, নার্সিংহোমে অপারেশন করছেন, গোপনে বড় ডাক্তারের সাহায্যে গেছেন, কেউ সিনেমা গেছেন, চা খাচ্ছেন, ঘুমোচ্ছেন অথবা 'জনগণের সেবা করো' ছাপানো কয়েক হাজার পোস্টার দেওয়ালে সাঁটতে গেছেন। 'সেবা' করবার ফুরসত কই? ...হাসপাতালগুলিতে খোঁজ নিন, ওষুধ কিম্বা রক্ত নয় স্রেফ অবহেলাতে অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা আমাদের চমকে দেবে।...অনুসন্ধান করুন, সাধারণের কাছে এইসব ভণ্ডামি, সংস্কারের মুখোস খুলে দিন, প্রতিবাদ করুন, মিছিল করুন।..." (বি-ও-বি, জুলাই অক্টোবর 1984)।

ডাক্তারের অবহেলাজনিত ভুল চিকিৎসাই রোগীর মৃত্যুর কারণ—এরকম অভিযোগে একটি মামলার খবর বি-ও-বি প্রকাশ করেছে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1985)।

এ প্রসঙ্গে এক পাঠকের প্রতিক্রিয়া : "চিকিৎসকের ইচ্ছাকৃত অবহেলায় মৃত্যুর ঘটনা এদেশে এত অসংখ্য যে, কেন তার বিরুদ্ধে যুঝবার জন্য কোনও সংস্থা গড়ে উঠছে না, অবাক লাগে" (নভেম্বর-ডিসেম্বর 1985)।

"ভুপাল", জাতীয় চেতনা ও ভারতীয় বিজ্ঞান

উনিশশো চুরাশিতে হাজার কয়েক মানুষের মৃতদেহের বিনিময়ে "ভূপাল" আর একবার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মানুষ কত অসহায় আজকের আধুনিক প্রযুক্তির হাতে। বোঝা গেল, কীটনাশক তৈরির মতো একটা বিপজ্জনক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করার আগে তা থেকে কি ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং সে ধরনের দুর্ঘটনার মোকাবিলা

কিভাবে করতে হবে, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনা-অনুমোদনকারী-বিজ্ঞানীরা ছিলেন একেবারে অজ্ঞ। এবং ভারতীয় বিজ্ঞানের এই হাল যে, দুর্ঘটনার পর চার বছর হতে চলল অথচ আজও গ্যাসপীড়িত মানুষের কোনো সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতি বের করা তো দূরের কথা ভূপালের মারণ গ্যাস আক্রান্ত মানুষের শরীরবৃত্তে কি পরিবর্তন এনেছে, বংশপরম্পরায় কোনো পরিবর্তন সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা আছে কি না বা থাকলে কতটা, সেসব নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে উঠল না।...আসলে ঘটনাটাকে গোটা দেশ জুড়েই আর পাঁচটা ঘটনার মতো ক্যাজুয়ালি নেওয়া হয়েছে। তা না হলে এদেশের বিজ্ঞানগবেষণা এগোতে পারত ভূপালের দুর্ঘটনাপরবর্তী সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানের খোঁজে।

ভারতীয় জনস্বাস্থ্যবিজ্ঞান কি তন্দ্রাচ্ছন্ন ?

এ রাজ্যের বেশ কিছু এলাকায় পানীয় জলের মাধ্যমে আর্সেনিক শরীরে ঢুকে বিষক্রিয়া ঘটানোর খবর প্রথম জানা যায় 1984-র গোড়ার দিকেই (বি-ও-বি মার্চ-এপ্রিল 1984)। গত বছরও এ নিয়ে হৈ চৈ হোলো। কিন্তু কই ? কিছু ব্যবস্থা হওয়া দূরে থাক, কেন যে পানীয় জলে, আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে, তার কোনো বৈজ্ঞানিক উত্তর এই তিন বছরেও মিলল না। অথচ অল ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথের মতো "আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন" "দেশের সেরা" জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ রাজ্যেই...তিন বছরেও একটা স্থানীয় জনস্বাস্থ্যসমস্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার মতো জায়গায় ভারতীয় বিজ্ঞান কি আজও পৌঁছতে পারেনি ?

স্বাস্থ্যের বিজ্ঞান স্কুলেই শেখানো শুরু হোক

স্বাস্থ্য সম্পর্কে বহু ব্যবস্থা নিতে ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না। উপযুক্ত ট্রেনিং থাকলে এই ব্যবস্থা অ-ডাক্তার জনগণ নিজেরাই নিতে পারেন। কিন্তু এই ট্রেনিং কিভাবে হতে পারে ? উত্তরে সুখময় ভট্টাচার্যের প্রস্তাব (বি-ও-বি, মার্চ-এপ্রিল 1983) স্বাস্থ্য বিষয়টিকে স্কুলপাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় ধরে "কামস্কাটকা কোথায় অবস্থিত" জাতীয় তথ্য মুখস্থ করে, যার সাথে রোজকার জীবনের কোনো যোগ নেই। এর জায়গায় যদি আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত দৈহিক বিপদে প্রাথমিকভাবে কী করণীয় বা বাড়িতে কারও ছোঁয়াচে রোগ হলে অন্য সকলের জন্য কী কী সাবধানতা নিতে হবে বা নিজের পরিবারের সাধ্যের মধ্যে কোন্ কোন্ খাবার থেকে বেশি পুষ্টিমূল্য পাওয়া যাবে, বয়ঃসন্ধির বিস্ময় ও সমস্যা, এসব নানা বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে দেওয়া যায়, তাহলে আখেরে লাভই হবে।

জনস্বাস্থ্য আন্দোলন : লাতিন আমেরিকায়

"মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে পাহাড়ী এলাকায় একটি গ্রাম—অজয়া। সতের বছর আগে এই গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এর মূলে ছিলেন একজন বিদেশী। নাম তাঁর ডেভিড ওয়ার্নার...। পেশায় স্কুল শিক্ষক এবং নেশায় একজন প্রকৃতিবিদ। একবার ঘুরতে ঘুরতে মেক্সিকোর পাহাড়ঘেরা এলাকায় এসে পড়েন। এখানকার পরিশ্রমী মানুষজন এবং তাদের অমায়িক বন্ধুসুলভ আচরণ তাঁকে মুগ্ধ করে। আবার ব্যথিতও করে এখানকার মানুষদের নিত্যকার রোগপীড়া এবং অপুষ্টির সমস্যা। তিনি চিকিৎসাবিদ্যার লোক ছিলেন না। তথাপি এখানকার মানুষজনদের দেখে তাঁর মনে হয় এদের উদ্যম এবং কর্মকুশলতার সাথে যদি বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার সংযোগ ঘটানো যায় তো এ সমস্যার মোকাবিলা সম্ভব।

"সেটি ছিল 1964 সাল। তিনি ফিরে এলেন দেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালের এমার্জেন্সি বিভাগে কিছুদিন শিক্ষানবিশী ক'রে ফিরে গেলেন মেক্সিকোর সেই গ্রামে।...শুরু হোলো তাঁর মানুষের মধ্যে কাজ, মানুষকে নিয়ে কাজ। এদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে নতুন ভাবে জানলেন মানুষ, সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কগুলিকে। অপুষ্ট শিশু, রুগ্ন মাতা, মানসিক ভারসাম্য হারানো বিদ্রোহী কিশোর পুত্র, রোগজর্জর ক্ষেতমজুর পিতা, মান্ধাতার আমলের ভূমিসম্পর্ক—এক সুতোয় বাঁধা দেখলেন সব। প্রলেপ দেবেন কোথায়, ওষুধ দেবেন কাকে ? তথাপি ধৈর্যের সাথে শুরু করলেন কাজ। আন্তরিক সহযোগিতা পেলেন স্থানীয় মানুষদের, নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন মানুষের মধ্যে নিহিত উদ্ভাবনী ক্ষমতা। তাঁর ছোট উদ্যোগ ক্রমে বড় আকার নিল। নাম হ'ল—Piaxtla Project। নিজেদের হাতে গড়া এই কেন্দ্রের প্রভাব অজয়া গ্রামের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে চারপাশের একশোটি গ্রামে বিস্তৃত হোলো। ছিলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র—সাথে গড়ে উঠল স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও। গড়ে উঠতে লাগল বিরাট সুনিপুণ কর্মীদল। শুরু হওয়ার দশ বছরের মধ্যেই পরিচালন ব্যাপারে গ্রামের মানুষ নিজেরাই দক্ষ এবং স্বয়ম্ভর হয়ে উঠল। এটিই ছিল ডেভিড ওয়ার্নারের স্বপ্ন। তিনি ধীরে ধীরে সরিয়ে নিলেন নিজেকে। কেন্দ্র চলতে লাগল আপন শক্তিতে।" (বি-ও-বি, মার্চ-এপ্রিল 1983 থেকে)।

লাতিন আমেরিকার জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের পথিকৃৎ কর্মী ডেভিড ওয়ার্নারের চিন্তাভাবনা বি-ও-বি প্রকাশ করেছে। ওয়ার্নারের কথায়, "স্বাস্থ্যপ্রকল্পের প্রচারে তখনই সুস্থ অবস্থা আসবে যখন চিকিৎসাবিদেরা নেতৃত্বাধীন থাকবেন আর নেতৃত্ব দেবেন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীরা।

জনস্বাস্থ্য আন্দোলন : বাংলাদেশে

বাংলাদেশে "মুক্তিযুদ্ধে"র সময় "ব্রিটেনে বসবাসকারী কয়েকজন তরুণ চিকিৎসক নাড়ীর টানে দেশে ফিরলেন। পাকিস্তানী দখলদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অংশীদার হয়ে গড়ে তুললেন যুক্তফ্রন্টে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একমাত্র হাসপাতাল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চিকিৎসা-ফ্রন্টের তরুণ সৈনিকেরা কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করলেন এই 480 শয্যার বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল চালানোর মাধ্যমে। স্বাধীনতা এল—জন্ম নিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এক ফ্রন্টের লড়াই অন্য ফ্রন্টে বিস্তার লাভ করল—শুরু হোলো গ্রামের মানুষের কাছে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেবার সংগ্রাম। বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হোলো "গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে"র। 1972 সালে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র চ্যারিটেবল ট্রাস্ট

বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে রেজিস্ট্রিকৃত হোলো।

..."গ্রামের গরিব মানুষকে সাথে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীরা উপলব্ধি করলেন, 'দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন নয়। শুধু চিকিৎসা মানুষকে সুস্থ রাখতে পার না।

প্রয়োজনীয় খাদ্য, পুষ্টি, বসবাসযোগ্য বাসস্থান, পরিবেশ এবং শিক্ষা না থাকলে ভালো স্বাস্থ্যের প্রশ্নই ওঠে না।'...(এই উপলব্ধি থেকেই) স্বাস্থ্য প্রকল্পের প্রসারের সাথে সাথে গড়ে উঠল গণ-কৃষি খামার, গণ-পাঠশালা, নারীকেন্দ্র, গণ-শিল্পালয়, গণ-পাদুকা কেন্দ্র, গণ-প্রকাশনা, গণ-প্রচারণা এবং গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্।" (বি-ও-বি, মে-জুন 1983 থেকে)। অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক ওষুধকে নিষিদ্ধ করতে (যাদের অনেকগুলোই আমাদের দেশে অবাধে বিক্রি হচ্ছে) বাংলাদেশ সরকারকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সদর্থক ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। "মাসিক গণস্বাস্থ্য" গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি প্রকাশনা।

জনস্বাস্থ্য আন্দোলন : এদেশে

এদেশে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন এখনও শুরু হয়নি। তবে এদিক ওদিক কিছু কিছু জনস্বাস্থ্যের কাজকর্ম চলেছে। যেমন, কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা ও সামাজিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কাজ চালিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুরলীধর দেবীদাস আমতে, সংক্ষেপে "বাবা" আমতে। উত্তরপ্রদেশের শারানপুরে কুষ্ঠরোগীরা ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে স্বনির্ভরতার পথে পা বাড়িয়েছেন "নির্মাণ কুষ্ঠ আশ্রম"কে ঘিরে। দল্লীরাজহরার ঠিকা শ্রমিক (কনট্রাক্ট লেবার) ও তাঁদের আত্মীয়স্বজনেরা নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন "শহীদ হাসপাতাল"। এ রাজ্যে "ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম" অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক ওষুধকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। "নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন" জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পুস্তিকা প্রকাশ ক'রে যাচ্ছেন।

শেষ করছি জুলাই-আগস্ট উনিশশো বিরাশির বি-ও-বি'-র কথা আরেকবার ব'লে : "বিভিন্ন অসুখ থেকে মুক্তি থেকে শুরু ক'রে মানুষের প্রাথমিক খাদ্যের অভাব নিয়ে আলোচনা—এভাবে না এগিয়ে, আমরা শুরু করতে চাইছি ভারতবর্ষের মানুষের প্রাথমিক খাদ্যের অভাব থেকেই। প্রাথমিক খাদ্য, তার সাথে ন্যূনতম আশ্রয়, পরিধেয় বস্ত্র, সুস্থ বাসস্থানের পরিবেশ—এ সমস্যাটুকু থেকে শুরু না করলে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের দিশাটাই যাবে উল্টে। কতখানি চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, এ তর্কটুকু বেড়ে উঠবে ন্যূনতম প্রয়োজনের সমস্যা বেড়ে ওঠার সাথে সাথেই। একটা যদি আন্দোলন হোতো—দু'হাজার সালের মধ্যে সমস্ত মানুষকে প্রাথমিক খাদ্য যোগান দেওয়ার, বা দু'হাজার সালের মধ্যে প্রাথমিক খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান যোগান দেওয়ার—ভারতবর্ষের মানুষের কাছে, এমনকি আমাদের কাছেও, মনে হোতো, আন্দোলনের দিশাটুকু হারিয়ে যাবে না। আর সেইমতো আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়া যেতো নিরন্ন মানুষের চিকিৎসাকেন্দ্রের পরিবর্তে, অসংখ্য জনবসতি আর ধানক্ষেতের মাঝখানে। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের বুকভরা আশা নিয়ে।" □

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বি-ও-বি'তে গত দশ বছরে প্রকাশিত লেখাপত্রের সূচী

লেখা	লেখক	সংখ্যা
1. ভারতবর্ষ : জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাচিত্র	মূল রচনা - কে. নাগরাজ অনুবাদ - পার্থ সেন	জুলাই-আগস্ট 1977
2. খাদ্যে মেশানো মনোরম বিষ	বিনয় সরকার	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি 1978
3. কুষ্ঠরোগ : সমাজ ও বিজ্ঞানের চোখে	রতনলাল ব্রহ্মচারী	জুলাই-আগস্ট 1978
4. রাসায়নিক বিপদ আমদানি	রবীন মজুমদার	নভেম্বর-ডিসেম্বর 1978
5. এনসেফেলাইটিস	শান্তশ্রী সিংহরায়	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি 1979
6. গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী : দাসত্বের না মুক্তির দিশারী ?	মূল রচনা - ভেভিড ওয়ার্নার অনুবাদ - পার্থ সেন	জুলাই-আগস্ট 1979
7. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঢাকা (বাংলাদেশ)	অংশুতোষ খান	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1979
8. ভারতীয় শিশুদের অপুষ্টি : ক্যালরী বনাম প্রোটিন	অভিজিৎ লাহিড়ী	নভেম্বর-ডিসেম্বর 1979
9. আকুপাংচার গবেষণা	আর. এল. ব্রহ্মচারী, এম. গাঁতাইত, জে. জে. মুখার্জি, এইচ. চন্দ্র, পি. এল. ভট্টাচার্য	মার্চ-এপ্রিল 1980

লেখা	লেখক	সংখ্যা
10. স্বল্পমেয়াদী ডাক্তারী পাঠ্যক্রম : একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ	রবীন মজুমদার	মার্চ-এপ্রিল 1981
11. জনস্বাস্থ্যনীতি ও ডিপ্লোমা মেডিক্যাল কোর্স : একটি মত	সুব্রত চট্টোপাধ্যায়	মে-জুন 1981
12. ক্যানসারের কারণ কী ? একটি বিতর্ক	নিজস্ব প্রতিবেদক	জুলাই-আগস্ট 1981
13. ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ কঠিন কেন ?	সন্ধানী	,,
14. ডাক্তারবাবু কোথায় ?	সন্ধানী	জুলাই-আগস্ট 1981
15. ক্যানসার ও 'সিকাফেক'	,,	,,
16. ম্যালেরিয়া বাড়ছে	,,	,,
17. কুষ্ঠ রোগের সম্ভাব্য প্রতিষেধক টিকে	,,	,,
18. আকুপাংচার : অসাড়তা সৃষ্টির ব্যাখ্যা	অভিজিৎ লাহিড়ী	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1981
19. মাছ খাওয়ার অভ্যেস কি হৃদরোগের সম্ভাবনা কমায় ?	গৌতম ব্যানার্জি	,,
20. শিশুহত্যা	সন্ধানী	,,
21. এদেশে চিকিৎসকদের সাফল্য : বাইরে থেকে রক্ত না দিয়ে ওপ্‌ন হার্ট সার্জারি	,,	,,
22. মানবদেহে পরীক্ষানিরীক্ষা : কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা	সুখময় ভট্টাচার্য	নভেম্বর-ডিসেম্বর 1981
23. ক্যানসার : কবিরাজি দাওয়াই	সন্ধানী	,,
24. ক্যানসার ও হোমিওপ্যাথ	,,	,,
25. চিকিৎসক ও ভাস্কর	সঞ্জয় মিত্র	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি 1982
26. অ্যান্টিবায়োটিক্‌স্ : হাতিয়ার কি এখন বুমেরাং ?	গৌতম ব্যানার্জি	,,
27. ওষুধের কথা	সুখময় ভট্টাচার্য	মার্চ-এপ্রিল 1982
28. ম্যালেরিয়া বাড়ছে বিপজ্জনকভাবে	সন্ধানী	,,
29. জলের ভাবনা	,,	,,
30. দূষিত রক্ত	সন্ধানী	মে-জুন 1982
31. মেকী ওষুধ : সরকারের কিছুই বলার নেই	,,	,,
32. অ্যালার্জি	টি. আহমেদ	জুলাই-আগস্ট 1982
33. জলাভাব ও মানবদেহ	পীযূষকান্তি সরকার	নভে-ডিসে. '82 ও জানু-ফেব্রু. '83
34. খরায় অনাহার ও মানবদেহ	সৌমেন গুহ	নভে-ডিসে. '82 ও জানু-ফেব্রু. '83
35. স্কুল-স্বাস্থ্য প্রকল্প	সুখময় ভট্টাচার্য	মার্চ-এপ্রিল 1983
36. আত্মবিশ্বাসী মানুষ সন্ধানে—"Helping Health Workers Learn"	রবীন চক্রবর্তী	,,
37. সরষের তেল ও হার্ট-ব্লক	রবীন মজুমদার	,,
38. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র—সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগ্রামের ইতিহাস	জ্ঞানব্রত শীল	মে-জুন 1983
39. সরষের তেল ও হার্ট-ব্লক	গৌতম ব্যানার্জি	,,
40. অবহেলিত চিকিৎসাব্যবস্থা ও ডাক্তারবাবুদের সাম্প্রতিক আন্দোলন	পার্থ সেন	জুলাই-আগস্ট 1983
41. "বাবা" আমতে	সন্ধানী	,,

লেখা	লেখক	সংখ্যা
42. সেঁকো বিষের কবলে পশ্চিমবঙ্গ	রবীন মজুমদার	মার্চ'-এপ্রিল 1984
43. গ্রাইপ ওয়াটারে শিশুর কান্না থামলেও বিপদ বাড়ে	সন্ধানী	,,
44. জানবার কথা—আন্ত্রিক রোগের জীবাণুর শ্রেণীবিভাগ	রঞ্জন ভদ্র	মে-জুন 1984
45. ওষুধ নিয়ে মাথাব্যথা	রবীন চক্রবর্তী	জুলাই-অক্টোবর 1984
46. আন্ত্রিক মহামারী : সেমিনার ও কিছু প্রশ্ন	বিশেষ প্রতিবেদক	,,
47. কুষ্ঠ আশ্রম—কিন্তু অন্য ধরনের	সন্ধানী	,,
48. তৃতীয় বিশ্বের অসুখ—ওপরতলার বিরাট প্রচেষ্টা	,,	,,
49. কৃত্রিম অণুজীব-রিফকিন বিতর্ক—আন্ত্রিক রোগ	সন্ধানী	নভেম্বর-ডিসেম্বর 1984
50. রক্ত বেচে রুজি রক্ত থেকে পুঁজি	অসীম চট্টোপাধ্যায়	,,
51. ভূপালের ডায়েরি—চিকিৎসাচিত্র	সুজিত কুমার দাশ	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি 1985
52. ড্রাগ কনভেনশন : যা মনে হল	নিজস্ব প্রতিবেদক	,,
53. এবারে কি তবে হেপাটাইটিস মহামারী ? কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য	সম্পাদকমণ্ডলী	,,
54. জনস্বাস্থ্য বনাম কীটনাশক	সুব্রত শীল	মার্চ'-এপ্রিল 1985
55. স্বাস্থ্য-ওষুধ-মানুষ	সুজিত কুমার দাশ	,,
56. টেকনোলজি ডাম্পিং—সঙ্গে রোগ ও মৃত্যু	রবীন চক্রবর্তী	,,
57. মিনামাতা	পার্থ সেন	মে-আগস্ট 1985
58. সম্প্রতি ভূপালে	দেবল দেব	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1985
59. চিকিৎসা : দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক আর নয়	বিশেষ সংবাদদাতা	,,
60. ভূপালে চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে তোলার লড়াই	পুণ্যব্রত গুণ	নভেম্বর-ডিসেম্বর 1985
61. হাত বাড়ালেই ওষুধ	স্মরজিৎ জানা	,,
62. ক্যানসারের প্রতিকার : কষ্টকল্পনা বনাম বিজ্ঞান	ভাস্কর মৈত্র ও সুকুমার সাহা	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি 1986
63. কার স্বার্থে বেবিফুড	স্মরজিৎ জানা	,,
64. সাপের ওঝার সাথে কিছুক্ষণ	অঞ্জন চতুর্বেদী	নভেম্বর-ডিসেম্বর 1986
65. আদিবাসী চিকিৎসা : একটি বিকল্প ব্যবস্থা	সুনীল মাহাতো	মার্চ'-এপ্রিল 1987

হিরোশিমা : একটি নন-ফিকশান

বই পরিচিতি

[John Richard Hersey : *Hiroshima* (Bantam Books, New York, 1946)]

"যারা এই বোমা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, যুদ্ধ-অপরাধীদের (War-Criminals) মতো তাদেরকেও ফাঁসীকাঠে ঝোলানো উচিত" —জন হার্সির 116 পৃষ্ঠার ছোট্টো বইটি পড়লে বোধহয় যে কোনো মানুষই ঐ কথাই ভাববে।

কিন্তু না। শাস্তি হয়নি। 1945-এর 6 আগস্ট-এর হিরোশমা বা বা 9 অগস্ট-এর নাগাসাকি'র 'বিজেতা'দের আমরা শাস্তি দিইনি। সবচেয়ে যোগ্য শাস্তি হতে পারতো যা, অর্থাৎ নিউক্লিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে মিলিত মানুষের সরব বলিষ্ঠ প্রতিবাদ—তা হয়নি। সারা পৃথিবী একসাথে একই সুরে তীব্র ঘৃণায় '45-এরই 16 জুলাই'কে "ইতিহাসের মসীলিপ্ততম দিন" হিসাবে চিহ্নিত করেনি।—যে দিনটিতে নিউ মেক্সিকো'র আল্-মোগোর্ডো'য় অস্‌কিউরো গ্রামের কাছে জরনাডো ডেল মুওর্তো নামে একটি এলাকায় বিশ্বের প্রথম নিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণ হয়েছিলো।

'প্রয়োগ-নিরপেক্ষ' বিজ্ঞানকে অস্বীকার করিনি আমরা সবাই। 'অশান্ত পরমাণু'র 'শান্তি'পূর্ণ ব্যবহারের ফল-আউট তাই আজ থ্রি মাইল আইল্যান্ড হয়ে চের্নোবিল-এর পথে।

হার্সির "হিরোশিমা" এই অমানবিকতারই আয়না বুঝিবা। ফ্রিমান ডাইসন (**Weapons and Hope**, 1984) থেকে শুরু করে জোনাথন শেল (**The fate of the Earth**, Alfred & Knopf, New York,

1982)—সবাইকেই উদ্বুদ্ধ করেছে এ বই। অন্যদিকে স্যামুএল ম্যাক্-ক্র্যাকেন-এর মতো প্রো-নিউকও, চেনা-পরিচিত আরও অনেক অ্যান্টি-নিউক্লিয়ার নন ফিক্শন সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করলেও (**The War against the Atom**, Basic Books, Inc., Publisher, New York, 1982) এ' বইটি সম্বন্ধে নিশ্চুপ।

হার্সি জাপানে গিয়েছিলেন '45-এর পরে পরেই। সব দগদগে ঘা তখনও শুকোয়নি। শোক আর হাহাকার, কান্না আর অসহায়তা তখনও মুছে যায়নি। বইটিতে পর পর তিনি দেখিয়েছেন এই এক বছরের ঘটনা। অর্থাৎ প্রথমে বোমা পড়ার সময়ে কে কি অবস্থায় ছিলো, কার অভিজ্ঞতা কি। তারপর—ঠিক পরের মুহূর্তে কে কিভাবে আত্মীয় বন্ধু সহ নিরাপদ স্থানে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। পরের দিনগুলোতে নানা প্রতিকূল অবস্থার মুখে দাঁড়িয়ে মানুষগুলির ভূমিকা এসেছে এর পরে। অবশেষে এক বছর পরে যুদ্ধ তখন থেমে গেছে—ভাঙা ঘর আর ভাঙা মন নিয়ে হিরোশিমাবাসী কি করছে—বইটির শেষে আছে তারই বর্ণনা।

গোটা বইটিতে ঘুরে ফিরে এসেছে হার্সির খুঁজে বার করা ছ'টি চরিত্র। হিরোশিমার মুষ্টিমেয় "ডজন-জীবন-পাওয়া" আর "অসংখ্য-মৃত্যু-দেখা" ভাগ্যবান্ (?) মানুষদের মধ্যে ছ'জন। মিস তোশিকো সাসাকি—ইস্ট এশিয়া টিন ওয়ার্ক্স-এর পারসোনেল ডিপার্টমেণ্ট-এর ক্লার্ক, 4টা বেজে 15 মিনিটে যিনি তাঁর পরের টেবিলের মেয়েটির সঙ্গে গল্প করার জন্যে মুখ ঘুরিয়েছিলেন—প্লান্ট অফিসে বসে। ডঃ মাসাকাজু ফুজি, যিনি ঐ সময়ে তাঁর প্রাইভেট হস্পিট্যাল-সংলগ্ন, নদীর-ওপর-ঝুলে-পড়া গাড়ীবারান্দায় বসে 'ওসাকা আসাহি' সংবাদপত্রটি পড়ছিলেন। মিসেস হাত্সুয়ো নাকামুরা, যুদ্ধে মৃত এক দর্জির পত্নী, যিনি সংসার চালাতেন সেলাইয়ের কাজ করে—ঠিক সে মুহূর্তে তিনি উল্টো দিকের এক প্রতিবেশীর বাড়ী ভাঙা দেখছিলেন রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে। সোসাইটি অফ জেসাস-এর জার্মান পাদ্রী ফাদার উইল্হেল্ম ক্লেইন্সোর্জ তিনতলার ঘরে বসে একটি ধর্মীয় পত্রিকা পড়ছিলেন। ডঃ তেরুফোম সাসাকি—শহরের বিশাল, আধুনিক রেড ক্রস হস্পিট্যালের ডাক্তার—তিনি ঐ সময়ে হস্পিট্যালের করিডোর দিয়ে যাচ্ছিলেন—এক রোগীর রক্তের ওয়াসার্ম্যান টেস্ট করার উদ্দেশ্যে। হিরোশিমা মেথডিস্ট চার্চ-এর পাদ্রী রেভারেণ্ড মিঃ কিয়োশি তানিমোতো—বিমান আক্রমণের ভয়ে এক ঠেলাগাড়ী ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে যিনি কোই-এর এক ধনী লোকের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন—খালাস করবেন বলে। তানিমোতো ছিলেন বোমা পড়ার জায়গা থেকে 3500 গজ দূরে—তিনি দেখেছেন একটা তীব্র আলো খেলে যাওয়া—সূর্যের ঝলকানি মনে হয়েছে তাঁর। মিসেস নাকামুরা ছিলেন 1350 গজ দূরে—তিনি দেখলেন এক শ্বেতশুভ্র ঝিলিক। 1550 গজ দূরে ডঃ ফুজি দেখেছেন উজ্জ্বল হলুদ রঙের ঝিলিক। ক্লেইন্সোর্জ অনুভব করেছেন পরে—তাঁর মনে পড়েছে ছোটো-বেলায় পড়া পৃথিবী-উল্কা সংঘর্ষের কথা—তিনি ছিলেন 1400 গজ দূরে। ডঃ সাসাকির মনে হয়েছে ফোটোগ্রাফিক ফ্লাশ—ঘটনাস্থল থেকে 1650 গজ দূরে ছিলেন তিনি। চোখ-অন্ধ-করে-দেওয়া আলো দেখেছিলেন মিস সাসাকি —1600 গজ দূরে বসে।

এর সঙ্গে সঙ্গে আর্ত, পীড়িত আরও কিছু মুখ। কিছু ফুলের মতো জীবন। যারা বোঝেনি—আসলে জিনিসটা কি যা ওটা-নদীর-সাত-শাখানদী-ঘেরা তাদের প্রিয়তম শহরে নামিয়ে এনেছে বিভীষিকা। কেউ ভেবেছে, মিঃ 'বি' (B-29 বিমান—যা হিরোশিমায় 'রোগা লোক' নামের বোমা ফেলেছিলো—তাকে ওরা ঐ নামেই ডাকতো) থেকে গ্যাসোলিন ছড়ানো হয়েছে। কেউ বা ভেবেছে প্যারাশুটিস্টরা ঘটিয়েছে এই কাণ্ড। কেউ কেউ কোনো দাহ্য গ্যাস বা অন্য কোনো দহনকারী পদার্থের কথাও ভেবেছে। তারপর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট-এর দম্ভভরা ঘোষণা সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে জানালো যে এ কাজ সেই অ্যাটমিক বোমার—যার ক্ষমতা কুড়ি কিলোটন ট্রাই-নাইট্রো-টুলইন (TNT)-এর থেকেও বেশী—এ পর্যন্ত যুদ্ধে ব্যবহৃত সবচেয়ে বেশী ক্ষমতার বোমা ব্রিটিশ গ্রান্ড স্লাম-এর থেকেও দু'হাজার গুণ বেশী বিস্ফোরণ-ক্ষমতা যার। আশু ধ্বংস ও বর্তমান রেডিও-অ্যাক্টিভিটি ছাড়াও Low Level Radiation-এর মাধ্যমে অনেক দিন পর্যন্ত মানুষের অসুস্থতা-পঙ্গুত্ব-মৃত্যুর কারণ হবে যা। বোমার এথিক্স নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় বা মন ছিলো না অধিকাংশ জনের। এই প্রবল শক্তির সামনে মানুষের তীব্র অসহায়তা বার বার ফুটে উঠেছে বইটিতে।

আর ঐ ছ'জন? এক বছর পরে তাদের অবস্থাটা কি? মিস সাসাকি পঙ্গু। মিসেস নাকামুরা নিঃস্ব। ফাদার ক্লেইন্সোর্জ হস্পিট্যালে। ডঃ সাসাকি হারিয়েছেন কাজ করার ক্ষমতা। ত্রিশ কামরার হস্পিট্যাল হারিয়েছেন ডঃ ফুজি—যা আর কোনোদিনই গড়ে তোলার সামর্থ্য হবে না তাঁর। তানিমোতোর চার্চ গেছে—আর গেছে তাঁর প্রবল প্রাণশক্তি।

বইটির এক জায়গায় আছে—ছোট্টো মেয়ে মিয়েকো এই বিচিত্র ধ্বংস দেখে অবাক বিস্ময়ে মাকে বলছে—"এরই মধ্যে রাত নেমে এলো কেন মা? আমাদের বাড়ীটা পড়ে গেল কেন। কি ঘটেছে মা? মাগো, তুমি চুপ করে আছো কেন?" মিয়েকোর মায়ের মতো কোনো মাকে শিশুর ঐ কৌতূহলের আগাম উত্তর জোগায়নি কেউ। কোনো পলিটিক্স বা কোনো বিজ্ঞান। রুজভেল্ট, চার্চিল থেকে ট্রুম্যান, গর্বাচভ; অ্যালবার্ট আইন-স্টাইন, এন্রিকো ফের্মি থেকে শুরু করে লিও শিলার্ড, এড্ওআর্ড টেলার—কেউ এই দায় থেকে মুক্ত নন।

হার্সি আমাদের দেখিয়েছেন, কি একান্ত সহমর্মিতায় হিরোশিমার মানুষ একে অপরকে সাহায্য করেছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করেছে কত শত শত লোককে, মুমূর্ষুকে চাঙ্গা করে তুলেছে—সরকারী মেডিকেল সহায়তা ছাড়াই—আধুনিক হস্পিট্যালের ধ্বংসাবশেষ—এমনকি ট্রাডিশনাল জাপানী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়েও। মৃত্যুমুখী মানুষকে ফিরিয়ে এনেছে জীবনে। এই মানুষগুলি আমাদের শিখিয়েছে, মানবতার প্রচণ্ড লজ্জা আর অপমানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেমন করে জীবনের গান গাইতে হয় আর তীব্র ধিক্কারে বলতে হয়—"No Hiroshima", "No Nuke", "No to All Evils"।।

তাপস ঘোষ

নিকারাগুয়ার ডায়েরী

অনিল গুপ্তা

অনিল আমাদের বন্ধু। থাকে নিকারাগুয়ায়। ওখানকার 'নানা ডিপার্টমেণ্টে' কাজ করে। দেশে পড়াশুনো শেষ করে গিয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেখান থেকে নিকারাগুয়ায়। মাঝে মধ্যে চিঠি দেয়। ওখানকার খবরাখবর জানায়। জানায় ওর মতামত। গত চিঠিতে একটি দুঃসংবাদ জানিয়েছে। ওর এক বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে মার্কিনী গুণ্ডাবাহিনীর হাতে। বন্ধুও ওর সাথে গিয়েছিল সেখানকার পুনর্গঠনের কাজে সহযোগিতা করতে। চিঠির এই অংশটি বি-ও-বি'র পাঠক-বন্ধুদের জন্য বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন **সুরশ্রী চৌধুরী**।

গত চার সপ্তাহ ধরে এক গভীর শোক আমাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। এপ্রিল মাসের 28 তারিখে বেঞ্জামিন লিণ্ডার নামে আমার এক নিকট (আমেরিকান) বন্ধুকে 'কণ্ট্রা'রা ('contra'—আমেরিকার পোষা প্রতিবিপ্লবী গুণ্ডাবাহিনী) ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে। 1979-র বিপ্লবের সাফল্যের পর থেকে নিকারাগুয়ার হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে যে এই ভাবেই মেরে ফেলা হয়েছে, সে খবর আমার জানা ছিল। কিন্তু একজন অতিপরিচিত প্রিয়জনের এ ধরনের মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ শোনার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। এবং এ সংবাদ, বলাই বাহুল্য, আমার কাছে শুধু একটা হিসাবমাত্র ছিল না। ওই একই আক্রমণের ফলে তুজন স্থানীয় ব্যক্তিও মারা গিয়েছিলেন।

এখন আমি খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছি 'Low intensity warfare' বলে যে কথাটা এখানে চালু আছে তার অর্থ কি। কত হাজার নিকারাগুয়াবাসী এর ফলে তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন; তার চেয়েও বেশী সংখ্যক মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছেন!

বেন (সবাই ওকে এই নামেই ডাকত) ছিল 27 বছর বয়সী একজন mechanical engineer; নিকারাগুয়াতে সে কাজ করছিল 1983 থেকে। তার কাজের উদ্দেশ্য ছিল, দূরবর্তী যে সমস্ত অঞ্চলে এখনো জাতীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রসারিত হয়নি, সে সব জায়গায় ছোট-খাটো জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করা। এক সময়ে সে যুক্ত ছিল শক্তি মন্ত্রকের (INE) সঙ্গে, যেটা আমারও কর্মস্থল। একই জায়গায় আমরা কাজ করতাম এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে আড্ডাও মারা হত, নানা-রকম প্রায়োগিক অসুবিধা নিয়েও আলোচনা হত। 1986-র শেষ নাগাদ INE-র আমলাতান্ত্রিক কার্যধারা সম্পর্কে বেশ কিছুটা হতাশ হয়েই সে সরাসরি ওই অঞ্চলের স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থায় যোগ দিয়েছিল। এর ফলে তাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মানাগুয়া থেকে স্থায়ীভাবে চলে যেতে হয় যুদ্ধের এলাকায়। এরই মধ্যে সে 'এল্ কুথা' নামে একটি ছোট শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলায় সাহায্য করেছিল। তাকে যখন খুন করা হয় তখনও সে নদীর প্রবাহমাত্রা মাপজোকের কাজ করছিল। আততায়ীরা প্রথমে বেন এবং তার সহকর্মীদের দিকে গ্রেনেড ছোঁড়ে এবং পরে কাছে এসে সরাসরি তার মাথায় গুলি করে। অপর তুই ব্যক্তিরও একই পরিণতি হয়।

নিকারাগুয়ার কোন ইঞ্জিনিয়ারই এই অঞ্চলে কাজ করতে সম্মত হত না। বেন ভালভাবেই জানত একাজে তার জীবনের ঝুঁকি আছে। মৃত্যুর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে সে এক সাংবাদিককে বলেছিল যে তার জানা আছে যে সে নিজে এবং তার প্রকল্প 'কণ্ট্রা'-দের খতম তালিকায় আছে...

বেনকে তার ইচ্ছানুযায়ী উত্তরের একটি পার্বত্য শহর Matagalpa-য় সমাহিত করা হয়। তার কফিনবাহকের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্রপতি ড্যানিয়েল ওরটেগা এবং বিদেশমন্ত্রী মিগুয়েল ড' এসকটো (D'Escoto)।

বেন-এর মৃত্যুসংবাদ কেবল নিকারাগুয়া নয়, আমেরিকায়ও যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সেই প্রথম একজন আমেরিকান নাগরিক নিকারা-গুয়ার সরকারের হয়ে কাজ করতে এসে কণ্ট্রাদের হাতে প্রাণ হারাল। সবচেয়ে তুঃখজনক ব্যাপার এই যে একমাত্র কোন আমেরিকান নাগরিকের মৃত্যুই সেদেশের প্রচার মাধ্যম, জনসাধারণ এবং সরকারকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারে। একজন আমেরিকান নাগরিকের মৃত্যুতে সেদেশে যে পরিমাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, সেটা ইতিপূর্বেই নিহত হাজার হাজার নিকারা-গুয়াবাসীর মৃত্যুর থেকেও অনেক বেশী। এ ঘটনাগুলি মনে পড়িয়ে দেয় ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা। তখন আমেরিকার সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল যুদ্ধে মাত্র 50000 মানুষ, অর্থাৎ আমেরিকান নাগরিক মারা গেছে। দশ লক্ষাধিক ভিয়েতনামবাসীর মৃত্যুকে তারা হিসাবের মধ্যে গণ্যই করত না।.....

R. N. 34929/79
YEAR 11 NUMBER 4

A bi-monthly magazine
VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o A. Lahiri
EC 106, Salt Lake, Cal-64
Jan.-Feb, 1988

Calcutta University Latest Publications

1. **East Indian Bronzes**
edited by Sisirkumar Mitra pp. 167. Plates 133. Rs. 140·00

2. **Mahamahopadhyay Gopinath Kaviraj's Grantha and Rachana Panji** (in Bengali)
edited by Mahendranath Chakravorty. Demy pp. 82. Rs. 3·00

3. **Mahamahopadhyay Gopinath Kaviraj Smarak Lecture, 1978**
by Dr. Govindagopal Mukhopadhyay. Rs. 2·00

4. **Ananda Coomaraswamy** (A Centenary Volume)
edited by Kalyan Kumar Dasgupta. Rs. 60·00

5. **A Linguistic Study of Personal Names and Surnames in Bengali**
by Dr. Bhabataran Dutta. Rs. 80·00

6. **Liberty, Equality, Property and the Constitution**
by P. Jagmohan Reddy. Rs. 90·00

7. **The Goldsmith Community in Calcutta**
Dr. D. Banerjee. Rs. 15·00

8. **Bharatiya Darsan Shastrer Tulanamulak Alochana**
Dr. Mahanama Brata Brahmachari. Rs. 4·00

9. **Comparative Aspects of the Pituitary Gland**
by Dr. B. B. Roy. Rs. 275·00

10. **Mahamahopadhyay Gopinath Kaviraj Memorial Lectures**
by Kalidas Bhattacharyya. Rs. 30·00

11. **The Human Journey**
by Edwin A. Burtt. 1981. pp. 196. Rs. 30·00

12. **Social Justice in a Mixed Economy**
by Dr. Bhabatosh Dutta. 1982. pp. 64. Rs. 4·00

13. **Neuro-endocrinological Studies in Stress**
by Dr. B. B. Dutt. pp. 521. Rs. 90·00

14. **Catalogue of Paintings of the Asutosh Museum, Ms. of the Ramacaritamanasa**
by Niranjan Goswamy. Rs. 250·00

15. **Hundred Years of the University of Calcutta**
is a must for every household. Limited Stock. Price Rs. 25·00

ISSUED BY
The Publication Department, Calcutta University
48, HAZRA ROAD, CALCUTTA-19

নামপত্র : অতি দাস □ প্রচ্ছদ : সমীর রায়

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিণ্টিং সেণ্টার, 18B ভুবন ধর লেন, কলকাতা-12 থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত